ষষ্ঠ বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৹

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।৹

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ; ফাল্গুন বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত আলফাতিহার তফছীর ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ...	৩২৩
২।	মুছলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন...	(অনুবাদ) আলকোরায়শী	৩৩১
৩।	হাদীছ লিখনের প্রাথমিক ইতিহাস ..	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন, বাসুদেবপুরী ...	৩৩৫
৪।	নিজামুল-মুল্ক ...	সগীর এম, এ, ...	৩৩৮
৫।	নয়া সমাজ ...	আতাউল হক	৩৪৪
৬।	দুষখের অবিনশ্বরত্ব (বিতর্ক ও বিচার)	... ...	৩৪৮
৭।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী ... প্রতিপক্ষের যবানী	(অনুবাদ) আহমদ আলী	৩৫১
৮।	সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচনা) ..	... ...	৩৫৫
৯।	মহা প্রলয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ...	(সংকলন)	৩৬০
১০।	সাময়িক প্রসংগ ...	সম্পাদক ...	৩৬৫

বাহির হইয়াছে—

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের বিরামহীন সাধনার অমৃতময় ফল—

নবী মোস্তফার (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা ও চরমত্ব সম্বন্ধে বাঙলা ভাষাভাষীগণের খেদমতে অনুপম ছওগাত

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ—

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত্‌ আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৩৭)

মোটকথা 'হু' 'হু' অথবা 'ইয়াহু' শব্দের সাহায্যে যিক্‌র করার মধ্যে ঈমান-বিরোধী বহু প্রকার আশংকা বিদ্যমান রহিয়াছে আর শুধু একক একটি শব্দেরও দ্বীনে-ইছলামে কোন মূল্য নাই। মুছলিম বিদ্বানগণের অধিকাংশ এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি শুধু যদি আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাতে তাহার মু'মিন হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবেনা আর এই জন্যই শুধু একক শব্দের সাহায্যে শরীঅতে যিক্‌রের অনুমতি প্রদান করা হয়-নাই। শয়খুল্‌ ইছলাম ইবনে তয়মিয়া লিখিয়াছেন, জনৈক আরব কোন মুওয়ায্‌যিনকে বলিতে শুনিলেন, "আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান রছুলাল্লাহ" অর্থাৎ 'রছুলুল্লাহ'র পরিবর্তে মুওয়ায্‌যিন 'রছুলাল্লাহ' বলিতেছিল এবং ইহার তাৎপর্য হইতেছে,"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রছুলুল্লাহ মোহাম্মদ (দঃ)," অথচ আযানের তাৎপর্য হইতেছে, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল (দঃ) বটেন"। মুওয়ায্‌যিনের উক্তি শ্রবণ করিয়া আরব ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, ইহা কিরূপ বাক্য? ইহা বাক্যের সাবজেক্ট (Subject) কর্তৃপদ মাত্র, ইহার কর্মপদ অবজেক্ট (Object) কোথায়?

আর কর্মছাড়া শুধু কর্তৃপদের সাহায্যে বাক্য সম্পূর্ণ হইবে কেমন করিয়া?

কোরআনের ছুরত আল মুযযাম্মিলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আপনি আপনার রব্বের নাম জপ করুন। এইরূপ ছুরত আল আ'লাতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি আপনার মহান রব্বের নাম তছবীহ করুন। পুনশ্চ ঐ ছুরতে বলা হইয়াছে, যাহারা শোধিত হইল এবং স্বীয় রব্বের নাম জপ করিল আর নমায পড়িল সে সফলকাম হইল। আল্লাহ ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি আপনার মহিমান্বিত রব্বের নাম তছবীহ করুন! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উল্লিখিত আয়ত সমূহের সাহায্যে এক শব্দ বিশিষ্ট ইছ্‌ম (বিশেষ্যপদ) দ্বারা আল্লাহর ফিক্‌র করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। আমরা বলি, এরূপ দাবী সম্পূর্ণ বাতিল, এই সকল আয়তের সাহায্যে একশাব্দিক যিক্‌রের বৈধতা কিছুতেই প্রমাণিত হয়না! কোরআনের যথার্থ ব্যাখ্যার অধিকারী স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ), তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতিকূল অন্য কাহারো উক্তির কাণাকড়িও মূল্য নাই। ছুননের গ্রন্থ সমূহে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন ছুরত আলহাক্কার শেষ আয়ত - فسبح باسم ربك العظيم - 'আপনার মহিমান্বিত রব্বের নাম তছবীহ করুন' "ফাছাব্বিহ্ বে-ইছ্‌মে রাব্বিকাল আযীম" অবতীর্ণ হইল, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন, ইহাকে তোমাদের রুকুতে পালন করিবে এবং যখন অবতীর্ণ হইল—আপনার মহান রব্বের নাম তছবীহ করুন, "ছাব্বেহিছ্‌মা রাব্বিকাল আ'লা তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহাকে তোমাদের ছিজদায় পালন করিবে। "এই আয়তগুলি রুকূ ও ছিজদায় পালন করিবে," রছুলুল্লাহর (দঃ) এই উক্তির তাৎপর্য কি? ছহীহ বুখারী গ্রন্থে ইহার উত্তর মওজূদ রহিয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার রুকূতে "ছুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" এবং ছিজদায় "ছুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" পাঠ করিতেন, শুধু "ইয়া রব্ব," "ইয়া রব্ব" পাঠ করিতেননা। অতএব প্রমাণিত হইল যে, মহান রব্বের নামের তছবীহ এবং রব্বের নামের যিক্‌র ইত্যাকার আদেশের তাৎপর্য হইতেছে, অর্থবোধক সম্পূর্ণ বাক্যের সাহায্যে আল্লাহর যিক্‌র করা এবং ইহাই প্রকৃত ইবাদত।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মর্মের কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

বুখারী স্বীয় ছহীহগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, কোরআনের পর শ্রেষ্ঠতম বাক্য হইতেছে চারিটি এবং এগুলি কোরআন হইতেই গৃহীত:—ছুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াল্লাহু আকবর। উক্ত ছহীহ বুখারীতে রছুলুল্লাহর (দঃ) এই উক্তিও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, দুইটি বাক্য রসনায় লঘু কিন্তু শ্রবনে ভারী, রহমানের প্রেয়স:— ছুবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দিহি, ছুবহানাল্লাহিল আযীম। বুখারী ও মুছলিম উভয় গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি দৈনিক একশতবার— লাইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকো ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কদীর বলিবে—সে ব্যক্তির জন্য সমস্ত দিবস সন্ধ্যার সমাগম পর্যন্ত শয়তান হইতে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা আল্লাহ অবলম্বন করিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবসে একশত বার বলিবে—ছুবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দেহি, ছুবহানাল্লাহিল আযীম, তাহার পাপরাজি সমুদ্রফেনের পরিমাণ হইলেও উহা মুছাইয়া দেওয়া হইবে।

ইমাম মালিক তদীয় মুওয়াত্তা গ্রন্থে রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যাহা বলিতেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র হইতেছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কো ওয়া লাহুল হামদো ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লে শায়ইন কদীর"। ইবনে মাজা প্রভৃতি স্ব স্ব ছুননে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র হইতেছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর শ্রেষ্ঠতম দোআ হইতেছে 'আলহামদু লিল্লাহ'। যিক্‌র এবং দোআ সম্পর্কিত এই ধরণের বহু হাদীছ রহিয়াছে।

افضل ما قلته انا والنبيون من قبلى : لااله الا الله وحده لاشريك له' له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير !

افضل الذكر : لااله الاالله وافضل الدعاء ! الحمدلله !

এইরূপ কোরআনে কথিত হইয়াছে, যেসকল প্রাণীর যবহে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়-নাই, তাহা ভক্ষণ করিওনা, আলআনআম ১২২। উক্ত ছুরতেরই ১১৯ আয়তে আদেশ করা হইয়াছে, যদি তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস পোষণ কর, তাহাহইলে যেসকল প্রাণীর যবহে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হইয়াছে তাহা ভক্ষণ কর। ছুরত আল-মায়েদার চতুর্থ আয়তে আদেশ করা হইয়াছে যে, তোমাদের শিকারী কুকুর যে-শিকারকে ধরিয়া রাখে তাহা ভক্ষণ কর এবং যবহের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। এই আয়ত সমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করার তাৎপর্য হইতেছে, 'বিছমিল্লাহ' উচ্চারণ করা এবং এই পূর্ণ বাক্যটি বৈয়াকরণগণের প্রকাশ্য উক্তি অনুসারে 'ইছমিয়া' হইবে আর যদি ফে'লীয়া হয় তাহাহইলে বাকটির রূপ হইবে 'যবহী মিছমিল্লাহ' অথবা 'আয্‌বাহো বে-ইছমিল্লাহ' অর্থাৎ আমার যবহ্ আল্লাহর নামের সংগে অথবা আমি আল্লাহর নাম সহকারে যবহ করিতেছি।

ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه !

فكلوا مما ذكراسم الله عليه !

فكلوا مما امسكن عليه واذكروا اسم الله عليه !

এইরূপ পাঠকের 'বিছমিল্লাহেররহমানিররহীম' বাক্য উচ্চারণ করার প্রকৃত রূপ হইতেছে, 'কিরা-আতি বিছমিল্লাহ' অথবা 'আকরাউ বেইছমিল্লাহ' অর্থাৎ আমার পাঠ আল্লাহর নামে, অথবা আমি আল্লাহর নাম লইয়া পাঠ করিতেছি। কোন কোন বিদ্বান 'বিছমিল্লাহ'র পূর্বে 'ইব্‌তিদায়ী' অর্থাৎ 'আমার সূচনা বা আরম্ভকে উহ্য মানিয়াছেন কিন্তু বিদ্বানগণের প্রথমোক্ত উক্তিই অধিকতর সুন্দর। কার্যের সূচনাই কেবল আল্লাহর নামের সংগে হয়না, যথা—আল্লাহর উক্তি 'ইকরা বে-ইছমে রাব্বিকাল্লাযী খালাকা' اقرأ باسم ربك الذى خلق অর্থাৎ হে রছুল (দঃ) আপনি আপনার রব্বের নাম লইয়া পাঠ করুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা ছুরত হূদে কথিত হযরত নূহের উক্তি 'আরুকাবূ ফিহা বিছমিল্লাহে মজ্‌রীহা ওয়া মুর্‌ছাহা' অর্থাৎ তোমরা নৌকায় আরোহণ কর আল্লাহর নামের সংগেই উহার চলন্ত হওয়া ও থামিয়া যাওয়া। এই আয়তগুলিতে আল্লাহর নামের সংগে 'আরম্ভ করা' কে উহ্য মান্য করা সুসমঞ্জস হয়না।

اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها !

নিম্নলিখিত হাদীছগুলির অর্থ লক্ষ করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, শুধু একক আল্লাহ শব্দ যিক্‌রের জন্য উচ্চারণ করা বিধেয় নয়ঃ ঈদুল-আযহার কুরবানী সম্বন্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি নমাযের পূর্বে যবহ করিয়াছে সে উক্ত কুরবানীর স্থলে আর-একটি প্রাণী যবহ করিবে এবং যে ব্যক্তি নমাযের পূর্বে যবহ করেনাই, সে আল্লাহর নাম লইয়া যবহ করিবে। এইরূপ বিশুদ্ধ হাদীছে কথিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) উমর বিনে আবি ছলমাকে আদেশ করিলেন, আল্লাহর নাম গ্রহণ কর এবং দক্ষিণ হস্তে ভক্ষণ কর আর খাদ্য পাত্রের যে অংশ তোমার কাছাকাছি, সেই স্থান হইতে খাইতে আরম্ভ কর।

من كان ذبح قبل الصلوة' فليذبح مكانها اخرى' و من لم يكن ذبح فليذبح بسم الله !

بسم الله و كل بيمينك و كل مما يليك !

এই সকল হাদীছে আল্লাহর নাম গ্রহণ করার অর্থ যে শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলা নয়, তাহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এসম্পর্কে আরো ভুরি ভুরি হাদীছ উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু পৃথি বাড়িয়া যাওয়ার আশংকায় আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

ফলকথা, মুছলমানগণের নমায, আযান, ঈদ এবং হজ্জ প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল যিক্র আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) কর্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছে, সেগুলির কোনটাই এক শাব্দিক অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য নয়। এক শাব্দিক প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য শব্দের সাহায্যে যিক্র করার কোন মূল্য শরীঅতে স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপ এক শাব্দিক যিক্রকে বিশিষ্ট ও কামিল ওলীগণের পরিগৃহীত যিক্রের রীতি বলিয়া অভিহিত করা চরম মূর্খতার পরিচায়ক। এই পদ্ধতির যিক্র মানুষকে বিভিন্ন প্রকার বিদ্আত ও গোমরাহী এবং বীভৎস দশা প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত একজন মু'মিন-মুছলিম, নাস্তিক ও অদ্বৈতবাদী দলের অন্তরভুক্ত হইয়া পড়ে।

কল্যাণের প্রকৃষ্ট পন্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্মের ভিত্তি দ্বিবিধ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হইতেছে, শুধু একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করা আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, যে পদ্ধতি বিদ্আত তাহা পরিহার করিয়া শরীঅত কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে ইবাদত করা। এই দুইটি নির্দেশকে ছুরত আল কহফের শেষ আয়তে স্পষ্টীভূত করা হইয়াছে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর فمن كان يرجوا لقاء ربه সন্দর্শন লাভের প্রত্যাশা فليعمل عملا صالحا ولا করে, তাহাকে সৎকার্যের يشرك بعبادة ربه احدا - অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং সে তাহার প্রভুর ইবাদতে আর কাহাকেও অংশী করিতে পারিবেনা।

আল্লাহর ইবাদতের এই সৌন্দর্য মহিমাই—কলেমায়ে তৈয়েবার মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহার প্রথমার্ধ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যে এই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো ইবাদত করিনা এবং অন্য কাহারো নিকটে সাহায্য যাচ্ঞা করি না এবং দ্বিতীয়ার্ধে এই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) মধ্যস্থতাতেই আমরা আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁহার ইবাদত-পদ্ধতির সন্ধান লাভ করিয়াছি। সুতরাং ইবাদতের জন্য রছুলুল্লাহর নির্দেশ সমূহকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং সেগুলির অনুসরণ করিয়া চলা একান্তভাবে আবশ্যক। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নবুওতের কর্তব্য পালন করিতে গিয়া মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত ইহা—দেদীপ্যমান করিয়া গিয়াছেন যে, 'আব্দ'কে কি ভাবে তাহার 'মা'বূদে'র 'ইবাদত' করিতে হইবে। ইবাদতের যেসকল পদ্ধতি কপোল কল্পিত এবং যেগুলির কোন ভিত্তি কোরআন ও ছুন্নাহর মধ্যে বিদ্যমান নাই সেগুলি তিনি সমস্তই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমরা শুধু আল্লাহকেই রব্ব মান্য করিব, তাঁহাকেই ভয় করিয়া চলিব, সকল বিষয়ে তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিব, তাঁহারই নিকট যাচ্ঞা করিব, আকুল হৃদয়ে তাঁহাকেই আহ্বান করিব, আমাদের সমুদয় কামনা ও আকাংখায় তাঁহাকেই কেন্দ্ররূপে বরণ করিয়া লইব এবং শুধু তাঁহারই দাসত্ব করিব। এইরূপে আমরা ইহার জন্যও আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমরা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আমাদের জীবন পথের ধ্রুব তারারূপে বরণ করিব, তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলিব, দ্বিধা ও শংকাহীন ভাবে কেন কিন্তু পরিহার করিয়া তাঁহারা সমুদয় আদেশ ও নিষেধ মান্য করিয়া লইব, তাঁহার পবিত্র পদচিহ্নকে আমাদের হাদী এবং পথ প্রদর্শক রূপে বরণ করিয়া লইব। তিনি যাহা হালাল করিয়াছেন শুধু তাহাকেই হালাল বলিয়া স্বীকার করিব এবং তিনি যাহা হারাম নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাকে অবশ্যই—হারাম বুঝিব। যে সকল বস্তুর সন্ধান তাঁহার পবিত্র বচন এবং চরিতামৃতে প্রাপ্ত হইব, শুধু সেই গুলিকেই 'দ্বীন' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব। ইহাই হইতেছে ছুরত আল ফাতিহার পঞ্চম আয়ত—**এইয়াকা না'বুদু ওয়া এইয়াকা'নছ-**

Contents

স্তঈন সম্পর্কে আমাদের শেষ কথা। এই আয়তে কথিত বিষয় সমূহের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করিয়াই ইহার ব্যাখ্যা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল।

ইবনে জরীর ও ইবনে আবি হাতিম হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ এই আয়তের তফছীর সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন : হে প্রভু, আমরা

اياك نعبد يعنى اياك نوحد ونـخاف ياربـنا لاغيـرك وايـاك نستـعيـن عـلى طاعندك وعلى امور كلها -

শুধু আপনাকেই একান্তরূপে বরণ ও আপনাকেই ভয় করিতেছি, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও নয় এবং হে প্রভু, শুধু আপনার নিকটেই আপনার আনুগত্যের জন্য এবং আমাদের যাবতীয় বিষয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। কতাদা বলেন, এই আয়তে

يامركم ان تخلصوا له العبادة وان تستعينوه على امركم !

আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার ইবাদতকে একান্ত ও অবিমিশ্র করার জন্য এবং তোমাদের যাবতীয় বিষয়ে শুধু তাঁহারই নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। ইমাম মুছলিম তদীয় ছহীহ গ্রন্থে আবু হোরায়রার বাচনিক উধৃত করিয়াছেন যে,

يقول الله تعالى : قسمت الصلوة بينى وبين عبدى نصفين' فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ماسأل - اذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال : حمدنى عبدى - واذا قال : الرحمن الرحيم' قال : اثنى على عبدى' فاذا قال : مالك يوم الدين' قال : مجدنى عبدى - واذا قال : اياك نعبد واياك نستعين' قال : هذا بينى وبين عبدى و لعبدى ما سأل' فاذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين' قال : هذا لعبدى ولعبدى ماسأل -

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, আমি নমাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধা আধি ভাবে বণ্টন করিয়াছি, উহার অর্ধেক আমার জন্য এবং অপর অর্ধাংশ আমার বান্দার জন্য এবং যাহা সে প্রার্থনা করিয়াছে, তাহা আমার বান্দার জন্য। যখন বান্দা বলে, 'আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন', আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশস্তি করিল। যখন বলে 'আর্রহমানিররহীম', আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার স্তবস্তুতি করিল। যখন বলে, 'মালিকে ইয়াওমেদ্দীন', আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গৌরব ঘোষণা করিল। যখন বলে, 'এইয়াকা না'বুদু ওয়া এইয়াকা নছ্তঈন', আল্লাহ বলেন, ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার এবং আমার বান্দা যাহা প্রার্থনা করিল, তাহা তাহার জন্য। যখন বলে, 'এহদিনাছ্ছিরাতল মুছতকীম্ ছিরাতল্লাযিনা আনআম্তা আলায়হীম, গাইরিল মাগযুবে আলায়হিম ওয়ালায্যাল্লীন,' আল্লাহ বলেন, ইহা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যাহা প্রার্থনা করিল, তাহা তাহার জন্য।

বাগাভী স্বীয় তফ্ছীরে, মাওয়ার্দী মা'রিফাতুছ্-ছাহাবা গ্রন্থে, তাবারানী স্বীয় মঅজমে আওছতে এবং আবু নঈম দলায়েল গ্রন্থে হযরত আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

قال: كنا مع رسول الله صلے الله عليه وسلم فى غزاة' فلقى العدو' فسمعته يقول : يامالك يوم الدين' اياك نعبد واياك نستعين - قال : فلقد رايت الرجال تصرع فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها -

আবু-তল্হা ছাহাবী বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে ছিলাম, শত্রুদলের সম্মুখীন হওয়ায় আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম, হে মালিকে ইয়াওমেদ্দীন, এইয়াকা না'বুদু ওয়া এইয়াকা নছ্তঈন। আবু তলহা বলেন, আমি দেখিলাম, শত্রুদলকে ভূপাতিত করা হইতেছে এবং ফেরেশ্তাগণ তাহাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে আঘাত করিতেছেন।

* * * * *

** ** ** **

ষষ্ঠ আয়াত

اهدنا الصراط المستقيم আমাদিগকে সরল-সঠিক-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করুন; صراط الذين انعمت عليهم যাহাদিগকে আপনি অনুগৃহীত করিয়াছেন তাহাদের পথে।

আয়াত সমূহের পারস্পর্য,

যে আল্লাহ সমুদয় বিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও উপাস্য প্রভু, যিনি কৃপানিধান দয়াময়, যিনি চরম মীমাংসা দিবসের অধিপতি ও অধিকারী, সমুদয় প্রশস্তি একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য সুতরাং মানুষকে একমাত্র তাঁহারই দাসত্ব স্বীকার ও তাঁহারই আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং মানবজীবনের পরম কাম্য যাহা, তাহা লাভ করার জন্য শুধু তাঁহারই কাছে যাচ্ঞা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এক্ষণে ৬ষ্ঠ আয়তে সেই পরম কাম্য—সরল-সঠিক সুদৃঢ় পথে চালাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হইতেছে।

এহ্‌দিনা আমাদিগকে হিদায়ত করুন।

হিদায়ত বা হুদা। হিদায়তের অর্থ হইতেছে, নেতৃত্ব করা, পথ প্রদর্শন করা, পথ ধরাইয়া দেওয়া, পথে দৃঢ় রাখা ও লক্ষ স্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়া। কোরআনের শব্দকোষে ইমাম রাগিব হিদায়তের অর্থ লিখিয়াছেন, অনুগ্রহ ও যত্ন সহকারে সঠিক পথে লইয়া যাওয়া—সন্ধান দেওয়া। * الهداية دلالة بلطف

বিখ্যাত আরাবী অভিধান 'তাজুল অরূছে' হিদায়তের তাৎপর্যে লিখিত হইয়াছে, যাহা ঈপ্সিত অর্থাৎ লক্ষস্থল, পরম যত্ন সহকারে তথায় লইয়া যাওয়া এবং পথ প্রদর্শন করা। الرشاد والدلالة بلطف الى ما يوصل الى المطلوب -

শুধু পথের সন্ধান প্রদান করাকেও কোরআনে "হিদায়ত" বলা হইয়াছে। ছুরত-ফুছ্‌ছিলতে উক্ত হইয়াছে, আমরা ছমূদ' জাতিকে পথের সন্ধান দিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা হিদায়ত অপেক্ষা অন্ধত্বকেই অধিকতর বরণীয় করিল—১৭ আয়ত। এই আয়তে হিদায়তের তাৎপর্য লক্ষ স্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়া নয়। কারণ লক্ষ লে উপনীত হওয়ার পর অন্ধত্বকে বরণ করার কোন অর্থ হইতে পারেনা। اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى

ছুরত-আলকছছে-সঠিক পথে লইয়া আসা, পথ ধরাইয়া দেওয়া এবং লক্ষ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়ার অর্থে হিদায়ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, যাহাকে আপনি ভালবাসেন, তাহাকে আপনি "হিদায়ত" করিতে পারিবেননা। কারণ হিদায়তের পথে লইয়া আসা এবং উক্ত পথে চালাইয়া দেওয়া এবং লক্ষস্থলে উপনীত করা আপনার কার্য নয়। প্রত্যুত আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই সঠিক পথে লইয়া আসেন— আল কছছ ৫৬ আয়ত। অথচ ছুরত-আশ্‌শুরার ৫২ আয়তে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ দিয়াছেন যে, আপনি অবশ্যই জনগণকে সরল, সঠিক ও সুদৃঢ় পথে "হিদায়ত" করিয়া থাকেন। وانك لتهدى الى صراط مستقيم -

প্রথমোক্ত আয়তে বলা হইয়াছে, 'লা-তাহ্‌দী' আপনি হিদায়ত করিতে পারেননা এবং এই আয়তে বলা হইতেছে, 'ল-তহদী' অর্থাৎ আপনি অবশ্যই হিদায়ত করেন। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, সকল ক্ষেত্রেই "হিদায়তে"র অর্থ অভিন্ন নয়। আল কছছের আয়তে কথিত "হিদায়তে"র অর্থ হইতেছে, সঠিক পথে চালাইয়া লক্ষস্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়া আর আশ্‌শুরার আয়তে উল্লিখিত "হিদায়তে"র তাৎপর্য হইতেছে সঠিক পথের সন্ধান দান করা।

ছিরাত (صراط), মূলতঃ ইহা 'ছীন' এর বানানে ছিরাত। ইহার অর্থ হইতেছে, রাজপথ—সুস্পষ্ট পথ, সরল পথ। পরবর্তী তোআ (ط) অক্ষরের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 'ছীন'কে ছোয়াদ (ص) এ পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

মুছ্‌তকীম (مستقيم) 'ইকামত' ও 'ইছ্‌তিকামত' হইতে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ। স্থানের 'ইকামত' ইহার অর্থ হইতেছে তথায় দৃঢ় হওয়া আর কোন বিষয়ে 'ইকামতে'র অর্থ হইতেছে উহার নিয়ম এবং দাবী যথাযথ ভাবে পূর্ণ করা। কোরআনের যে সকল স্থলে নমাযের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সর্বত্রই উহার জন্য 'ইকামতে'রই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার তাৎপর্য হইতেছে, নমাযকে তাহার নিয়ম ও শর্ত অনুসারে যথাযথভাবে আদা' করা আর পথের الاقامة فى المكان الثبات' واقامة الشئى تتوفية حقه -

* মুফরদাতুল কোরআন, ৫৬০ পৃঃ।

‘ইছ্‌তিকামত’ হইতেছে এরূপ পথ যাহা সরল এবং ঋজু রেখার মত— সমান্তরাল, বক্র ও অসমতল নয়। সত্য-পথকে এই অর্থেই ইছ্‌তিকামতের পথ বলা হইয়াছে। †

والاستقامة فى الطريق
الذى يكون على خط مستو
وبه شبه طريق المحق -

ইন্‌আম (انعام) পুরস্কার দান করা ও অপরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাকে ইন্‌আম বলা হয় কিন্তু মানুষ ছাড়া অপর কোন বাকশক্তি-হীন প্রাণীর জন্য— ইনআম শব্দ প্রযোজ্য হয়না, অর্থাৎ একথা বলিলে অশুদ্ধ হইবে যে, আমি আমার ঘোড়াকে ইনআম (পুরস্কৃত) করিয়াছি। রহম ও ইনআমের এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা কর্তব্য। §

والانعام ايصال الاحسان
الى الغير' ولايقال الا اذا
كان الموصل اليه من
جنس الناطقين -

ইমাম রাগিব মানুষের প্রতি আল্লাহর হিদায়তকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ জ্ঞান, অনুভূতি এবং বোধ শক্তির এরূপ সাধারণ ও ব্যাপক ‘হিদায়ত’ যাহা সৃষ্টির সংগে সংগেই প্রত্যেক প্রাণীকে প্রদান করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ যে ‘হিদায়ত’ মনুষ্য সমাজ নবী ও রছুলগণের মধ্যস্থতায় লাভ করে, হিদায়তের এই প্রকরণটি বিশ্বজনীন অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির জন্য এই হিদায়তকে ব্যাপক করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ যেব্যক্তি সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে তাহার ‘হিদায়ত’। ইহা সীমাবদ্ধ। চতুর্থ প্রকার ‘হিদায়ত’ চরম লক্ষ অর্থাৎ বেহেশ্‌ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া। ইমাম রাগিব ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর হিদায়ত লাভ করা যাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর হিদায়ত তাহার প্রতি প্রযোজ্য নয় এবং যে ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর হিদায়ত অর্জন করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ‘হিদায়ত’ লাভ করার উপায় নাই আর চতুর্থ শ্রেণীর হিদায়ত অর্জন করার— সৌভাগ্য যাহার ঘটিয়াছে, সে পূর্ববর্তী ত্রিবিধ হিদায়তেরই অধিকারী হইয়াছে।

গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, ‘হিদায়তের’ বর্ণিত প্রকরণগুলি সমস্তই আল্লাহর ‘রবুবীয়তে’র উৎস হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে এবং যে হিদায়ত জীব-জগতকে তাহার অস্তির বিকাশমুহূর্তে প্রদান করা হইয়াছে ওয়াহী ও নবুওতের হিদায়ত তাহারই শ্রেষ্ঠতম বিকাশ মাত্র।

‘রবুবীয়ত’ ও ‘রহমানীয়তে’র ব্যাখ্যা প্রসংগে ইহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে যে, আল্লাহর ‘রবুবীয়ত’ যেরূপ জীবজগতকে তাহাদের অবস্থানুরূপ দেহ ও অংগ প্রত্যংগ দান করিয়াছে, সেইরূপ উহা তাহাদের প্রাকৃতিক হিদায়তের স্বাভাবিক উপকরণগুলিও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই “হিদায়ত” প্রত্যেকটি সত্বাকে জীবন ও জীবনসংগ্রামের পথে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে এবং জীবন-ধারণের পক্ষে যে সকল বস্তু অপরিহার্য, উহা অহরহ তাহার অনুসন্ধানের পথ জীবজগতকে প্রদর্শন করিতেছে। এই প্রকৃতির ‘হিদায়ত’ বিদ্যমান না থাকিলে কোন সৃষ্ট-জীবের পক্ষে জীবন লাভ করা এবং বাঁচিয়া থাকার উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতনা। এ বিষয়ে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে মানুষের চিন্তাশক্তিকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অস্তিকে তাহার উন্মেষ মুহূর্ত হইতে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। কোরআনের ছুরত আল-আ’লায় এসম্পর্কে যথাক্রমে চারিটি স্তরের কথা উল্লিখিত আছে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন,

الذى خلق' فسوى' والذى
قدر' فهدى -

তিনি সেই মহান রব্ব, যিনি প্রত্যেকটি বস্তু সৃজন করিয়াছেন, অতঃপর উহাকে সমন্বিত করিয়াছেন এবং তিনিই উহার পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছেন, অতঃপর তাহার জন্য হিদায়তের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, —২ আয়ত। এই আয়তে সত্বার ক্রমবিকাশের জন্য চারিটি স্তরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা: সৃষ্টি, সমন্বয়, পরিমাণ নির্ধারণ এবং পথের নির্দেশ— হিদায়ত।

সৃষ্টির অর্থ হইতেছে—বিশ্বচরাচর এবং উহাতে অবস্থিত প্রত্যেকটি সত্বার উপকরণকে নেতি হইতে অস্তিত্বে লইয়া আসা।

সমন্বয়ের তাৎপর্য হইতেছে—যেবস্তুর যেরূপ হওয়া উচিত তাহাকে সেই ভাবে সুসজ্জিত এ সুগঠিত করা।

† মুফ্‌রদাত, ৪২৯ পৃঃ।
§ মুফরদাত, ৫৬০ পৃঃ।

পরিমাণ নির্ধারণ করার তাৎপর্য হইতেছে—আকারে, প্রকারে, ওযনে, দৈর্ঘে প্রস্থে সকল দিকদিয়া এবং সময় ও অবসরের দিকদিয়া সে বস্তুর যেরূপ আয়তন ও পরিমাণ হওয়া আবশ্যক, তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিয়া দেওয়া।

আর হিদায়তের অর্থ হইতেছে—প্রত্যেক সত্তার সম্মুখে জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট প্রকরণের নাম পাখী।

পাখীর সৃষ্টির উপাদান যখনই বিকশিত হইবে, আমরা উহাকে সৃজন নামে অভিহিত করিব।

পাখীর প্রকাশ্য ও গোপন অংগ প্রত্যংগগুলি এরূপ ভাবে গঠন করা হইয়াছে যে, দেহের সমুদয় অংশ সুঠাম ও সুসমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কার্যকে সমন্বয় সাধন বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

পাখীর প্রকাশ্য ও গোপন অংগ প্রত্যংগের কার্য ও আচরণ সমূহের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পরিমাপ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মগুলি উহাদের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেনা, যথা, পাখীগুলির জন্য এই নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে যে, উহারা শূন্যে উড্ডীয়মান হইবে, মাছের মত পানির অভ্যন্তরে বিচরণ করিবেনা। ইহাই হইল পাখীর তক্দীর, ব্যবস্থা বা পরিমাণ।

আর পাখীকে যে অনুভব শক্তি ও ইন্দ্রিয় বোধ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সাহায্যে উহারা জীবন ধারণের পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং জীবন ধারণের উপকরণ সমূহের সংগ্রহ কার্যে পাখীকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, ইহাই "হিদায়ত" নামে কথিত।

কোরআনের নির্দেশ এইযে, আল্লাহ স্বীয় রবুবীয়তের গুণের জন্য যেরূপ প্রত্যেক প্রাণীকে তাহার সত্তা দান করিয়াছেন, তাহার আভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য অংগ প্রত্যংগগুলিকে সুসমঞ্জস ও সুগঠিত করিয়াছেন, তাহার গতিবিধি ও কার্যকলাপের নির্দিষ্ট অবস্থা ও পরিমাপ ঠিক করিয়া দিয়াছেন, তেমনি তাহার জীবন ধারণ ও জীবিকার উপায় অবলম্বন করার জন্য তাহাকে হিদায়তের পথও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কথাই কোরআনে এই বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, যিনি আমাদের রব্ব তিনি প্রত্যেক বস্তুকে যেরূপ তাহার অবয়ব প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তাহার কর্মপথও প্রদর্শন করিয়াছেন—ছুরত তাহা, ৫০ আয়ত।

ربنا الذى اعطى كل شئى خلقه ثم هدى -

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার স্বদেশবাসীগণের যে কথোপকথন কোরআনের বিভিন্ন স্থলে উধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত ইবরাহীম স্বীয় মতবাদ নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণা করিতেছন: এবং যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা এবং তাঁহার স্বদেশবাসীকে বলিলেন,—তোমরা যেসকল বস্তুর ইবাদত করিতেছ, সেগুলির সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার সম্পর্ক কেবল তাঁহার সাথেই। কারণ তিনিই আমাকে হিদায়ত অর্থাৎ সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন—আয্যুখরুফ ২৬ ও ২৭।

واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون' الاالذى فطرنى فانه سيهدين -

খলীলুল্লাহর বর্ণিত উক্তির তাৎপর্য এই যে, যে প্রভু আমাকে আমার দেহ ও সত্তা দান করিয়াছেন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ব্যবস্থা তিনিই অবশ্য অবম্বলন করিবেন। ছুরত আশ্শোআরায় হযরত ইবরাহীমের এই কথা অধিকতর বাগ্মিতাপূর্ণ ভংগীতে উধৃত করা হইয়াছে। ইবরাহীম বলিয়াছিলেন, যে প্রভু—আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে হিদায়ত করিবেন এবং তিনিই আমাকে খাদ্য দান করেন ও আমাকে পান করাইয়া থাকেন আর আমি যখন পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন—৮০ আয়ত।

الذى خلقنى فهو يهدين' والذى هو يطعمنى ويسقين' واذامرضت فهو يشفين -

অর্থাৎ যে বিশ্বপতি তদীয় রবুবীয়তের দরুণ আমার জীবন যাত্রার সমুদয় প্রয়োজনীয় উপকরণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যিনি আমাকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্য এবং পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পানি আর পীড়ায় আরোগ্য দান করিয়া থাকেন, এহেন কৃপানিধান রব্বের পক্ষে আমাকে শুধু শুধু সৃষ্টি করিয়া আমার হিদায়তের সুব্যবস্থা না করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারেনা। যদি তিনি আমার স্রষ্টা হন, তাহাহইলে আমার কামনা ও সাধনার পথে তিনি যে আমার দিকদিশারী হইবেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারেনা। (ক্রমশঃ)

Contents

মুছলিম
রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

মূল :—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ :—আল্‌কোরায়শী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৫। আল্লাহ স্বীয় পবিত্র সত্তার শপথ করিয়া এই অভ্রান্ত ইছলামী নীতি বিঘোষিত করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সমুদয় ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপারে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সালিশ এবং বিচারক রূপে মানিয়া লইবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মু'মিনের পর্যায়ভুক্ত হইবেনা। সর্বোপরি ইহাও লক্ষ করা উচিত যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) বিচার ও মীমাংসাকে শুধু প্রকাশ্য ভাবে মানিয়া লওয়াই ঈমানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং ঈমানের অস্তিত্বকে প্রমাণিত করিতে হইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশের সম্মুখে পরম হৃষ্ট চিত্তেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে আর রছুলুল্লাহর (দঃ) যে আদেশের জন্য দেহ ও মনের এই আনুগত্য মু'মিনের নিকট দাবী করা হইয়াছে, সে আদেশের তাৎপর্য দ্বিবিধঃ হয় উহা আল্লাহর গ্রন্থ কোরআনের নির্দেশ মত হইবে অথবা আল্লাহ তদীয় রছুলকে যে প্রজ্ঞার অধিকারী করিয়াছেন তাহারই সক্রিয় বিকাশ "ছুন্নাহর" উপর উক্ত আদেশের ভিত্তি থাকিবে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, হে রছুল (দঃ), আপনার রব্বের শপথ! উহারা কিছুতেই ঈমানের অধিকারী হইবেনা, যতক্ষণ উহারা আপনাকে তাহাদের কলহ বিবাদ ও মতানৈক্যের মীমাংসাকারী মানিয়া না লইবে। অতঃপর আপনি যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহা মানিয়া লওয়ার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, আপনার মীমাংসায় তাহারা তাহাদের মনেও যেন কোনরূপ অসন্তুষ্টি বোধ না করে এবং আপনার মীমাংসার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেয়—আন্‌নিছা ৬৫ আয়ত।

فلا وربك لا يؤمنون' حتى يحكموك فيما شجر بينهم' ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما'

৬। ইছলামে যে কার্য বা বস্তু হারাম বা নিষিদ্ধ, লৌকিক আইনে তাহা হালাল ও বৈধ করিয়া দিলেও উহা হারামই থাকিয়া যায়। ইছ্‌লামে আইন প্রণয়নের অধিকার সীমাবদ্ধ এবং বিভিন্ন শর্তের অধীন। একজন মুছলমানের পক্ষেও এই সীমা ও শর্ত লংঘন করিয়া আইন রচনা করার উপায় নাই। যদি কোন আইন-পরিষদ বর্ণিত সীমা উল্লংঘন করিয়া ইছলাম বিরোধী কোন আইন রচনা করিতে এবং উহা প্রবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে কোন মুছলমানের পক্ষে এরূপ আইন শরীঅতের নির্দেশক্রমে অনুসরণীয় ও প্রতিপালন যোগ্য বিবেচিত হইবেনা। পক্ষান্তরে এই ধরণের আইনকে পরিবর্তিত করার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া অবশ্যকর্তব্য হইবে। ছুরত আন্‌নিছারই ৫৯ আয়তে বিশ্বাসপরায়ণদিগকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন—তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুগত হও এবং যাহারা তোমাদের মুছলিম শাসনকর্তা তাহাদেরও। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়া যায়, তাহাহইলে উক্ত বিষয়কে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের দিকেই ফিরাইয়া লইয়া যাও। যদি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া থাক তাহাহইলে ইহাই তোমাদের পক্ষে মংগলজনক এবং সর্বোত্তম ব্যবস্থা!

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ! فان تنازعتم فى شئى فردوه الى الله والرسول' ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر' ذلك خير و احسن تاويلا !

এই আয়তে আল্লাহ স্বীয় আনুগত্য এবং তদীয় রছুলের (দঃ) আনুগত্যের আদেশ দিয়াছেন। 'আনুগত্য কর'—এই ক্রিয়াপদটি আল্লাহর ন্যায় রছুলের (দঃ) জন্য স্বতন্ত্র ভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, রছুলের (দঃ) আনুগত্যের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। রছুলুল্লাহ (দঃ) যে বিষয়ের জন্য আদেশ দান করিয়াছেন, তাহা কোরআনে উল্লিখিত থাকুক কি না থাকুক, সে আদেশের আনুগত্য ওয়াজিব। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন যে,

আমাকে কোরআন এবং তাহার সংগে তাহারই অনুরূপ আর একটি বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে। আবার ইহাও লক্ষ করা উচিত যে, 'উলুল আম্‌র'—শাসনকর্তার বেলায় আনুগত্য শব্দটির পুনরুক্তি করা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ এবং তদীয় রছুল ব্যতীত অন্য কাহারো **স্বতন্ত্র এবং শর্ত ও সীমাহীন আনুগত্য নাই।** শাসনকর্তাগণের আনুগত্য সর্বদা আল্লাহ এবং রছুলের (দঃ) আনুগত্যের অধীন থাকিবে। আরো লক্ষ করা আবশ্যক যে, আল্লাহ এবং রছুলের আনুগত্যের কথা প্রথমে উল্লিখিত হওয়ার পর শাসকদলের আনুগত্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এইযে, আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) আনুগত্যের ব্যাপারকেই সর্বদা অগ্রণী করিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এবং রছুলের (দঃ) আনুগত্যের দাবী পুরাপুরি ভাবে পূর্ণ না করা হইবে এবং বিরোধের সকল প্রকার সম্ভাবনা তিরোহিত না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শাসকদের আনুগত্যের প্রশ্নই উত্থিত হইতে পারিবেনা। অতএব যে শাসনকর্তা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) নির্দেশ অনুসারে আদেশ প্রদান করিবেন কেবল তাঁহার আনুগত্যই ওয়াজিব, আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) প্রতিকূল আদেশ প্রদানকারী শাসনকর্তা মুছলিম জনগণের নিকট আনুগত্যের কোন দাবী করিতে পারেনা।

انى اوتيت القرآن ومثله معه !

শরীঅত বিরুদ্ধ আইন সমূহ প্রত্যাখ্যাত হইবার হাদীছী প্রমাণ

(৭) কোরআন ছাড়া ছুন্নাহতেও শাসনকর্তাগণের আনুগত্যের সীমা স্পষ্টভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে এবং আল্লাহর অবতীর্ণ নির্দেশের পরিপন্থী আদেশের অনুসরণ কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ছহীহ হাদীছগুলির অর্থ অনুধাবন করিলে আমাদের দাবী সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইবে।

(ক) রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেকার্যে স্রষ্টার অবাধ্য হইতে হয়, এরূপ কোন আদেশের আনুগত্য বৈধ নয়। আনুগত্য **শুধু বৈধ কার্যেই সীমাবদ্ধ।**

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق' انما الطاعة فى المعروف -

(খ) যেসকল শাসক তোমাদিগকে পাপ কার্যের আদেশ দেয় তাহাদের আদেশ শুনিওনা এবং তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিওনা।

من امركم منهم بمعصية' فلا سمع ولا طاعة -

(গ) মানুষের পক্ষে প্রীতিকর হউক অথবা অপ্রীতিকর, শাসনকর্তাগণের সর্ববিধ আদেশই শ্রবণ করা ও সেগুলির অনুগত হওয়া ওয়াজিব, অবশ্য যদি পাপ কার্যের জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তাহাহইলে সে আদেশ শ্রবণ করা এবং প্রতিপালন করা বৈধ নয়।

السمع والطاعة على المرء فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة -

(ঘ) রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে, আমার তিরোভাবের পর এরূপ একদল লোক তোমাদের শাসনভার প্রাপ্ত হইবে, যাহারা ছুন্নতকে নিশ্চিহ্ন আর বিদআতকে প্রবর্তিত করিবে আর নমাযকে নির্দিষ্ট সময় হইতে বিলম্বিত করিয়া পড়িবে। আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ নিবেদন করিলেন—হে আল্লাহর রছুল (দঃ), যদি আমি তাহাদের যুগ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তাহাহইলে আমি কি করিব? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ওগো উম্মে-আব্দের পুত্র, যেব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাহার আনুগত্য বৈধ নয়—এই কথা রছুলুল্লাহ (দঃ) তিনবার উচ্চারণ করিলেন।

انه سيلى امركم من بعدى رجال يطفؤن السنة و يحدثون البدعة ويوخرون الصلوة عن مواقيتها - قال ابن مسعود : يارسول الله' كيف بى اذا ادركتهم ؟ قال : ليس يا ابن ام عبد طاعة لمن عصى الله ! قالها ثلاث مرات

৮। রছুলুল্লাহর (দঃ) পর উম্মতে-মুছলিমার এবিষয়ে ইজমা হইয়াছে যে, শাসকগণের আনুগত্য শুধু আল্লাহর আদেশের অধীনেই বৈধ হইবে। মুজ্‌তাহিদ ফকীহগণও এবিষয়ে পুরাপুরিভাবে একমত হইয়াছেন যে, প্রকৃত শাসনকর্তা ও আদেশদাতা একমাত্র আল্লাহ! উক্তি অথবা মতবাদের দিক দিয়া এসম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে বৈষম্য নাই। তাঁহারা এবিষয়েও ইজমা করিয়াছেন যে, যেসকল বিষয়ের হারাম হওয়া সর্ববাদীসম্মত, সেগুলিকে হালাল এবং বৈধ মনে করা কুফর ও ধর্মত্যাগের নিদর্শন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেব্যক্তি ব্যভিচার ও মদ্যপানকে হালাল জানিবে অথবা আল্লাহ এবং তাঁহার রছুল (দঃ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও আদেশ

Contents

ও নিষেধের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অধিকারী বিশ্বাস করিবে তাহার এই ধারণা স্পষ্ট কুফর ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইরূপ যে শাসনকর্তা খোলাখুলি কুফর ও ধর্মত্যাগের কার্যে লিপ্ত হইবে তাহার বিরুদ্ধে উত্থান করা মুছলমানগণের জন্য ওয়াজিব। এই উত্থানের সর্বনিম্ন তাৎপর্য এইযে, তাহার যেসকল আদেশ ও নিষেধ ইছলাম বিরোধী সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে।

৯। ইছলামের মৌলিক নীতির দিকদিয়াও ইছলামী রাষ্ট্রের অধিনায়কবর্গকে আইন প্রণয়ন করার সীমাহীন ও অবাধ অধিকার প্রদান করা হয় নাই, কেবলমাত্র দ্বিবিধ আইন প্রণয়ন করার অধিকার তাঁহাদের জন্য স্বীকৃত হইয়াছে ঃ প্রথমতঃ শরীঅতের আদেশ ও বিধানগুলির প্রয়োগ ও প্রবর্তন সম্পর্কিত নিয়মকানুনগুলি তাঁহারা প্রণয়ন করিতে পারেন অর্থাৎ কি উপায়ে কোরআন ও ছুন্নাহর বিধানগুলি জনগণের মধ্যে কার্যকরী করিতে পারা যায়, তাহার নিয়মকানুন তাঁহারা রচনা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ ইছলামী সমাজব্যবস্থার সংগঠন ও সংহতির সংরক্ষণকল্পে এবং সমাজের সার্বজনীন প্রয়োজনগুলিকে মিটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রয়োজনীয় আইন রচনা করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন প্রণয়ন করার কার্য শুধু শরীঅত নিরপেক্ষ বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিবে। কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে, হয়ত এই শ্রেণীর আইন রচনা করার পথে কোনরূপ বাঁধাধরা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু এরূপ ধারণা সঠিক নয়, শেষোক্ত শ্রেণীর আইন রচনা কার্যেও আমাদিগকে ব্যাপক এবং পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয় নাই। বরং এরূপ ক্ষেত্রেও শরীঅতের স্পিরিট এবং উহার সার্বজনীন নীতি সকল সময় লক্ষ রাখার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং উহারই আলোকে সংগঠনমূলক আইনগুলি বলবৎ করিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উল্লিখিত উভয়বিধ আইনের প্রণয়নের কার্যও আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। আমাদের শাসকগোষ্ঠি (Ruling class) ও ব্যবস্থাপক সমাজ (Legislatures) একাধারে যেমন রছুলুল্লাহর (দঃ) খলীফা তেমনি সংগে সংগে তাঁহারা মুছলিম সমাজের প্রতিনিধিও বটেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) খলীফা রূপে কোরআন ও ছুন্নাহর নির্দেশ সমূহের চুলমাত্র ব্যতিক্রম করা যেরূপ তাঁহাদের পক্ষে বৈধ নয়, সেইরূপ মুছলিম জাতির প্রতিনিধি রূপে তাঁহাদের পক্ষে জাতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর ব্যতিক্রম করাও সম্ভবপর নয়। তাঁহাদিগকে রছুলুল্লাহর (দঃ) গৌরবমণ্ডিত খিলাফত এবং জাতির প্রতিনিধিত্বের সম্মান এই জন্যই সমর্পণ করা হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারা দ্বীনের প্রতিষ্ঠা কল্পে সচেষ্ট হন, দ্বীনে-ইছলামের বিধ্বস্তিকল্পে তাঁহাদিগকে এই আসন সমর্পণ করা হয় নাই।

১০। মুছলমানগণের রাজ্যশাসন বিধানের বুনিয়াদ হইতেছে শরীঅত। সুতরাং যে আইন শরীঅত-ভিত্তিক হইবে, তাহা বৈধ এবং যাহা উহার প্রতিকূল তাহা বাতিল হইবে। মনছুখ (Repeal) না হওয়া পর্যন্ত শরীঅতের বিধিনিষেধ অবশ্য প্রতিপালনীয় থাকিবে, কিন্তু আল্লাহর কোন গ্রন্থকে কেবল তাঁহার অপর গ্রন্থই মনছুখ করিতে পারে এবং এক রছুলের ছুন্নতেরই অন্য রছুলের ছুন্নতকে রহিত করার অধিকার রহিয়াছে। ঐশী গ্রন্থ ও নবীগণের আগমন ও অবতরণ এখন নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব শরয়ী-আইনের পরিবর্তন, সংশোধন ও রহিত-করণের কোন প্রশ্নই এখন উঠেনা এবং ব্যবস্থাপকগণের বিরচিত সংবিধানগুলি কোনক্রমেই ইছলামী সংবিধানের স্থান অধিকার করিতে পারেনা।

মিছরের প্রচলিত আইনের খণ্ডন

সাধারণ লৌকিক আইনের অবৈধতা প্রমাণিত হইল বটে কিন্তু মিছরের প্রচলিত আইন—সমূহের বাতিল হওয়ার অন্যবিধ কারণও রহিয়াছে। একটি প্রধান অন্যতম কারণ এই যে, এই সকল আইনের অধিকাংশই বুনিয়াদী নীতি সমূহের—(Basic Principles) বিরোধী। মিছরী আইনের বুনিয়াদী নীতির গোড়াতেই ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের প্রচলিত ও সরকারী ধর্ম 'ইছলাম' دين الدولة الرسمى هوالاسلام - হইবে—একথার অর্থ এই যে, আমাদের আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থার ভিত্তি হইতেছে ইছলাম। ইছলামই

এরূপ একটি উৎস ও কেন্দ্র যে, উহা হইতেই সমুদয় আইন-কানুন প্রতিপাদিত হইবে এবং শরীঅতকেই আদর্শ মান্য করিয়া উহারই নেতৃত্বে আইন রচনা করিতে হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই দফাটি আমাদের রাজনীতি, সমাজ জীবন, স্বরাষ্ট্র নীতি ও পররাষ্ট্র নীতির সমুদয় ভংগী ও পলিসিকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দফা অনুসারে আমরা ইছলামী শরীঅতের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম—এবং উহার স্পিরিটের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কোন আইন রচনা করার অধিকারী নই। অতএব একজন মিছরীর পক্ষে মিছরীয় আইনের বুনিয়াদী নীতি অনুসারে কর্তব্য হইতেছে—সমুদয় অনৈছলামিক আইনকে বাতিল মনে করা। কারণ ওগুলি Constitution বিরোধী। শাসন সংক্রান্ত আইন [Administrative Law] কে সকল সময় কনস্টিটিউশনের অধীনস্থ থাকিতে হয় এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে কনস্টিটিউশনের সমকক্ষতায় শাসন সংক্রান্ত আইনকে বাতিল করিয়া দিতে হয়। মিছরের আদালত সমূহে এই নিয়মের অনুসরণ করা হইয়াছে। মিছরের হাইকোর্ট ইং ১৮৬৫ সালের ১ নম্বর মীমাংসায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে,—কনস্টিটিউশনের কোন বুনিয়াদী দফা যদি কোন আইনে অবহেলা করা হইয়া থাকে, তাহাহইলে উক্ত আইন [Ultra vires of the Constitutions বলিয়া গণ্য হইবে। এই মীমাংসা সূত্রে ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রণীত একটি আইন বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কনস্টিটিউশনের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং আইনের দৃঢ়তার জন্য উৎকৃষ্টতম গ্যারান্টি হইতেছে—আইন রচনা কালে সর্বদা কনস্টিটিউশনের সীমানা রক্ষা করিয়া চলা। আদালতগুলিরও আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রবর্তন করার পুরাপুরি অধিকার রহিয়াছে এবং দুইটি আইনে পরস্পর সংঘর্ষ ঘটিলে আদালতের পক্ষে ইহা মীমাংসা করা উচিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি কনস্টিটিউশন বিরোধী এবং যেটি কনস্টিটিউশন—বিরোধী সেটিকে বাতিল করিয়া দেওয়া এবং কনস্টিটিউশনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।

সাধারণ আইন সম্পর্কে এই নীতিও সর্ব স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে আইনগুলি সর্বজনবিদিত ধ্যান-ধারণার বিপরীত, সেগুলির এরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত যাহাতে আইনের মৌলিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং উম্মতে মুছলিমা সম্পর্কে যখন ইহা সর্বস্বীকৃত যে, তাহাদের ইছলামের সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়ার অধিকার নাই, তখন বিজাতীয় আইনগুলি ইছলামী রাজ্য সমূহে প্রবর্তন করার প্রাক্কালে সেগুলির অনৈছলামিক অংশগুলিকে পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে—সকল পাশ্চাত্য আইন-কানুন আমাদের দেশে প্রবর্তিত করার হইয়াছে, সেগুলির আইনের মৌলিক—উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে কি ভাবে অকৃতকার্য হইয়াছে এবং আইনের সর্বজনবিদিত ধ্যান-ধারণার সহিত সেগুলির কি ভাবে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। অতএব এ দিক দিয়াও পাশ্চাত্য আইনগুলির—অনৈছলামিক অংশগুলিকে পরিহার করিয়া গ্রহণ করা উচিত এবং অসংশোধিত ও অপরিবর্তিত আকারে উল্লিখিত আইনগুলি কোন ক্রমেই ইছলামী রাজ্যসমূহে প্রবর্তন করা উচিত নয়।

পাশ্চাত্য আইনের বিষময় প্রভাব

পাশ্চাত্য আইনগুলি এরূপ দেশ হইতে আহরণ করা হইয়াছে যাহার পরিবেশ আমাদের পরিবেশ হইতে বিভিন্ন, সে সকল দেশের অধিবাসীর সহিত আমাদের ঐক্য খুবই সামান্য, কিন্তু বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। এই সকল আইনের কতকাংশ যেরূপ ভাল সেইরূপ মন্দও বটে, কতকগুলি আমাদের মতবাদের অনুকূল আর কতকগুলি প্রতিকূল, কতক আমাদের নীতি নৈতিকতা ও অভ্যাসের সহিত সুসমঞ্জস আর কতক অসমঞ্জস। ওগুলির কতক অংশকে আমাদের বিবেক ও অন্তর মান্য করিয়া লয় আর কতকগুলিকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এই সকল আইন আমাদের চিন্তা ধারাকে কলুষিত, আমাদের মননশীলতাকে বিক্ষিপ্ত আর আমাদের হৃদয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সামাদের সামাজিক জীবনে এই সকল আইনের ফলে বিশৃংখলা ঘটিয়াছে, আমাদের জাতীয় সংহতির মূলে আঘাত পড়িয়াছে, দুঃখে ও ব্যথায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ আর আমাদের বুক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মধ্যে ভয়াবহ ধরণের পরস্পর বিরুদ্ধ মনোভাব এবং রুচি বিকার টানিয়া আনিয়াছে, একই সময়ে যুগপৎভাবে আমরা একটি জিনিষকে যেমন হালাল বলিয়া থাকি তেমনি উহাকে হারাম বলিয়াও ঘোষণা করি। আমরা মুখে মুখে একটি নির্দিষ্ট মতবাদের অনুসারী বলিয়া দাবী করিলেও আমাদের আচরণ উহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইয়া থাকে। চিন্তা ও কর্মের এই বিরোধ ও অসামঞ্জস্য আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

হাদিছ লিখনের প্রাথমিক ইতিহাস

আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন—বাসুদেবপুরী।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছাহাবা যুগে হাদিছ লিখন।

হযরত নবীয়ে করিমের (দঃ) ছাহাবাগণের স্বর্ণ যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে হাদিছ লিখন সম্বন্ধে বহু ঘটনা অবগত হওয়া যায়। এতদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে হযরত আবুবকর ছিদ্দিকের (রাঃ) ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইস্‌লামের স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক হাফেয যহবী তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ তায্‌কেরাতুল্ হোফ্‌ফাযের (تذكرة الحفاظ) ৫ পৃষ্ঠায় এবং শয়খ আলী মোত্তাকীর বিখ্যাত গ্রন্থ কন্‌যুল্ উম্মালের (كنز العمال) ৫ম খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় এমাম হাকেমের বরাত দিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহর (দঃ) হাদিছগুলি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, যখন প্রায় পাঁচ শতাধিক হাদিছ লিখিত হইয়া যায় তখন এক দিবস তিনি ঐ সংগৃহীত হাদিছের দফ্‌তর খানিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন যে, আমি ইহাতে এমন কতকগুলি হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, যাহা আমি স্বয়ং হযরতের (দঃ) প্রমুখাৎ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই বরং অপরের মধ্যস্থতায় ও বাচনিক শুনিয়া তাহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা অসম্ভব নয় যে, যে-ব্যক্তি আমার নিকট যেরূপে হাদিছ বর্ণনা করিয়াছে, হয়ত হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তদনুরূপ বর্ণনা করেন নাই। অতএব অনর্থক আমি নিজ স্কন্ধে এই গুরু দায়িত্ব ভার বহন করা সমীচীন মনে করিনা।

দারেমীর ৩৮ পৃষ্ঠায় ও মুছতদ্‌রক ১ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) একখানা ফরমান উদ্ধৃত হইয়াছে যে, বিদ্যাকে কিতাবের (লিখনীর) আয়ত্বাধীন কর।

দারেমী ও মুছ্‌তদ্‌রক মধ্যে হযরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,—বিদ্যাকে (হাদিছকে) লিখিয়া স্বীয় আয়ত্বাধীন কর। এইরূপ ছহি মুছলিম ১মখণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে যে, হযরত আনছ (রাঃ) হযরত মাহমূদ এব্‌নুররবি ছাহাবার প্রমুখাৎ হযরত উত্‌বানের একটি দীর্ঘ হাদিছ শ্রবণ করেন এবং উহা লিখিয়া লইবার জন্য নিজ পুত্রকে আদেশ দান করেন। তদনুযায়ী তিনি উহা লিখিয়া লন। طحاوى (২) ৩৮৪ পৃষ্ঠায় হযরত আনছ (রাঃ) কর্ত্তৃক নিজ পুত্র দ্বারা হাদিছ লিখাইয়া লইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত আবু-হোরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহর (দঃ) যুগে প্রাথমিক অবস্থায় হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেননা। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নিজ হস্তে বা অপরের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া নিজ দফ্‌তরে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতেন।

ফতহুল্ বারী ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠায় হযরত হাছান এব্‌নে আমর (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক নিজ গৃহে লইয়া যান এবং হযরতের (দঃ) হাদিছ সন্নিবেশিত কতিপয় কেতাব দেখাইয়া বলিলেন, দেখ, এইগুলি আমার নিকট রহিয়াছে।

হযরত বশির বিন্ নোহায়ক বর্ণনা করিতেছেন যে, আমি হযরত আবু-হোরায়রার নিকট হইতে তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি চাহিয়া লইয়া নকল করিয়া লইতাম। অতঃপর সেগুলি তাঁহাকে শুনাইয়া বলিতাম, আপনি কি এই হাদিছগুলি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে অবিকল এইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিতেন, হাঁ, আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। (তাহাবী ২য় খণ্ড ৩৮৫ পৃঃ)।

হয্‌রত এব্‌নে আব্বাছের (রাঃ) কতকগুলি ছহিফা ছিল, উহাতেও কতিপয় হাদিছ লিপিবদ্ধ ছিল। বর্ণিত আছে যে, তায়েফের কতিপয় লোক

হযরত এবনে আব্বাছের নিকট তাঁহার কতকগুলি ছহিফা লইয়া উপস্থিত হন এবং বলেন, এইগুলি আপনি আমাদিগকে শুনাইয়া দিন। সেই সময় হযরত এবনে আব্বাছের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় স্বয়ং পড়িতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলিলেন, তোমরা ইহা শুনাইয়া দাও, তোমাদের শুনাইয়া দেওয়া ও আমার পাঠ করা রেওয়ায়তের জওয়াযের জন্য সমতুল্য।

(তিরমিযি (২) ২৩৮ পৃঃ ; তাহাবী (২) ৩৮৪ পৃষ্ঠা)।

আবুল্ বখতারী বর্ণনা করিতেছেন, আমি জনৈক ছাহাবা বা তাবেয়ীর নিকট হাদিছ শ্রবণ করি। অত্যন্ত ভাল বোধ হওয়ায় আমি তাঁহার নিকট সেগুলি লিখিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত করায় আমার প্রার্থনা মতে তিনি তাহা লিখিয়া আমাকে সমর্পণ করেন। (আবুদাউদ (২) ১৮ পৃঃ)।

হযরত আবান তাবেয়ী হযরত আনছের নিকট বসিয়া হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেন—عند انس رح رأيت ابان يكتب (দারেমী ৬৯ পৃষ্ঠ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মোহাম্মদ বিন্ আকিল বর্ণনা করিতেছেন—আমরা হযরত জাবেরের খেদ্‌মতে উপস্থিত হইয়া তাঁ হযরতের হাদিছগুলি জিজ্ঞাসা করিতাম এবং লিখিয়া লইতাম। তাহাবী (২) ৩৮৪ পৃঃ)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বিদ্যাকে (হাদিছকে) লিখনী দ্বারা আয়ত্বাধীন কর। (দারেমী ৬৯ পৃষ্ঠা)।

হযরত ছঈদ বিন্ জোবায়র বর্ণনা করিতেছেন—আমি হযরত ইবনে উমরের নিকট হাদিছ শ্রবণ করিতাম এবং তাহা লিখিয়া লইতাম। (দারেমী)

হযরত ছঈদ বিন্ জোবায়র প্রভৃতি হযরত ইবনে আব্বাছের নিকট হাদিছগুলি লিখিতে থাকিতেন। (দারেমী ১৬৯ পৃঃ ; তাহাবী (২) ৩৮৪ পৃঃ)

দারেমীতে ইহাও রহিয়াছে যে, যখন কাগজ পূর্ণ হইয়া যাইত, তখন অপর কোন বস্তুর উপর লিখিয়া লইতেন।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) আন্‌তারা কে হাদিছ লিখিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। (দারেমী ৬৯ পৃঃ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ খনশ্ বর্ণনা করিতেছেন, আমি হযরত বারার (রাঃ) মজলিছে অনেক ব্যক্তিকে হস্ততালুর উপর হাদিছ লিখিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। (দারেমী—৬৯ পৃঃ)

(যখন কাগজ পূর্ণ হইয়া যাইত, তখন হস্ততালুর উপর এইজন্য লিখিতেন যে, বাড়ী পহুঁচিয়া সেইগুলি কাগজে নকল করিয়া লইতে পারেন)।

হযরত হাছান বিন্ জাবের (রাঃ) হযরত আবু-উমামা বাহেলীকে হাদিছ লিখন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তদুত্তরে বলিলেন, উহা কোন দোষনীয় কার্য্য নহে।

হযরত আবু বোরদা আশ্‌আরী বর্ণনা করিয়াছেন—আমি আমার পিতা হযরত মূছা আশ্‌আরীর নিকট হাদিছ শ্রবণ করিতাম এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইলাম। এক দিবস আমার পিতা আমার লিখিত হাদিছগুলি চাহিয়া লইয়া আমাদ্বারা পড়াইলেন, পাঠ সমাপনান্তে তিনি বলিলেন হাঁ, আমি হযরতের (দঃ) নিকট অবিকল এই প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তবে আমার আশংকা হয় যে, ইহাতে কোনরূপ কম বেশী না হইয়া যায়।

(جامع الزوائد (১) ১৫১ পৃষ্ঠা)।

তাবেয়ীন যুগে হাদিছ লিখন

পূর্ব্বে যে সমস্ত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ছাহাবাগণের কেরামগণের সম্মুখে অথবা ছাহাবাগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাবেয়ীগণের সম্মুখে অথবা তাঁহাদের নিকট হইতে হাদিছ শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার বিষয় বর্ণিত হইবে।

(১) হযরত এবরাহিম নখ্‌য়ী বর্ণনা করিতেছেন যে, ছালেম বিন্ আবিল জা'দ হাদিছগুলি লিখিয়া লইতেন। সন ১০১ হিঃ সালে ছালেমের মৃত্যু হয়। তিনি কোন কোন ছাহাবা হইতেও হাদিছ শ্রবণ

করিয়াছেন। (তিরমিযি (২) ২৬৮ পৃঃ, দারেমী ৬৬ পৃঃ)।

(২) হযরত আবুয যিনাদ তাবেয়ী বর্ণনা করিতেছেন, আমরা যুহরীর (মৃঃ সন ১২৪ হিঃ) সহিত বিদ্বানগণের নিকট হাদিছ শ্রবণ করিবার জন্য গমন করিতাম। তিনি কাগজ ও তখ্‌তি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং যতগুলি হাদিছ শ্রবণ করিতেন, সমস্তই লিখিয়া লইতেন।

(تذكرة الحفاظ (১) ১০৩ পৃষ্ঠা।

(৩) ছালেম বিন কয়ছান বর্ণনা করিতেছেন, অধ্যয়ন যুগে আমি ইমাম যুহরীর সহপাঠি ছিলাম। একদা যুহরী আমাকে বলিলেন, আইস, আঁ হযরতের (দঃ) হাদিছগুলি লিখিয়া লই।

(كنز العمال (৫) ২৩৮ পৃষ্ঠা)।

(৪) রাজা' ইবনে হায়াত (মৃঃ ১১২ হিঃ) বর্ণনা করিতেছেন, হেশাম বিন্ আবদুল মালেক তাঁহার কর্ম্মচারীকে আমার নিকট একটি হাদিছ অবগত হইবার জন্য পত্র লিখেন। যদি সেই হাদিছ আমার নিকট লিখিত না থাকিত, তবে উহা আমি বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। দারেমী—৬৯ পৃঃ।

(৫) হিশাম এবনুল গায বর্ণনা করিতেছেন—আতা বিন্ আবি রেবাহ (মৃঃ ১১৪ হিঃ) তাবেয়ীর নিকট লোকে হাদিছ জিজ্ঞাসা করিত এবং তাঁহারই সম্মুখে লিখিয়া লইত। (দারেমী—৬৯ পৃঃ)।

(৬) ছোলায়মান বিন্ মূছা বর্ণনা করিতেছেন, আমি হযরত নাফে' (মৃঃ সন ১১৭ হিঃ) কে দেখিয়াছি, তিনি মৌখিক হাদিছ বর্ণনা করিয়া যাইতেন এবং লোক তাঁহারই সম্মুখে লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। (দারেমী)।

(৭) এক ব্যক্তি হাছান বছরীর (মৃঃ ১১০ হিঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট আপনার বর্ণিত কতিপয় হাদিছ লিখিত রহিয়াছে, আমি সেই হাদিছগুলি আপনা হইতে রেওয়ায়ত করিতে পারি কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ, পার। (তিরমিযি (২) ২৩৯ পৃঃ)।

হামিদ তাবিল হাছান বছরীর কেতাবগুলি নকল করিয়া ছিলেন।

(تهذيب التهذيب (৩) ৩৯ পৃষ্ঠা)।

(৮) এবনে জোরায়জ বর্ণনা করিতেছেন,—আমি হিশাম বিন্ উর ওয়ার (মৃত সন ১৪৬ হিঃ) নিকট একখণ্ড কেতাব লইয়া উপস্থিত হই এবং বলি, এই কেতাবে লিখিত রেওয়ায়তগুলি কি আপনার? আমি কি ইহা রেওয়ায়ত করিতে পারি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ, বর্ণনা করিতে পার। (তিরমিযি (২) ২৩৯ পৃষ্ঠা)।

(৯) হযরত আবু কলাবা (মৃত ১০৪ হিঃ) মৃত্যু কালে হযরত আইউব ছখ্‌তিয়ানীর জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ওসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন; উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া গ্রন্থগুলি শাম হইতে আনিত হইয়াছিল। হযরত আইউব বলিতেছেন,—আমি উক্ত উষ্ট্রের ভাড়া বাবত ১২।১৪ দিরাম প্রদান করিয়াছি। (تذكرة الحفاظ (১) ৮৮ পৃষ্ঠা)

হযরত নবীয়ে করিমের (দঃ) এন্তেকালের মাত্র একশত বৎসর পরবর্তী কালের তাবেয়ীন যুগের—কতিপয় বিবরণপ্রদত্ত হইল এবং তাঁহাদের মৃত্যু সন উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তাবাতাবেয়ীন যুগের বিবরণী পেশ করা যাইতেছে।

তাবা তাবেয়ীন যুগে হাদিছ লিখন

মোহাম্মদ বিন্ বশর বর্ণনা করিতেছেন যে, মছয়রের (মৃত ১৫৫ হিঃ) নিকট এক সহস্র হাদিছ লিখিত ছিল। আমি দশটী ব্যতীত যাবতীয় হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া ছিলাম।

আবদুর রাযযাক্ বর্ণনা করিতেছেন,—আমি মোআম্মারের (মৃত ১৫৩ হিঃ) নিকট দশ সহস্র হাদিছ শ্রবণ করিয়া লিখিয়া লইয়াছি।

(تذكرة الحفاظ (১) ১৭৫ পৃঃ)।

হাম্মাদ বিন্ ছলামার নিকট কয়ছ বিন্ ছা'দের একখানি লিখিত গ্রন্থ ছিল।

(تذكرة الحفاظ (১) ১৭৫ পৃঃ)।

যে সময় ছুফ্‌য়ান ছওরী ইয়ামান গমন করেন, সেই সময় তাঁহার জন্য জনৈক দ্রুত লেখক মোহাররিরের বিশেষ আবশ্যক হয়। হিশাম বিন্ ইউছুফ

"নিজামুল-মুল্ক"

সগির (এম-এ,)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যুদ্ধ জয়ের পর নিজামুল-মুল্কের গতিবিধি ও কার্যকলাপ

শকরখেরার যুদ্ধ জয়ের পর তথায় ৩৪ দিন অবস্থান করিয়া নিজামুল মুল্ক সৈন্যদিগকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিলেন। যথা নিয়মে নিহত ব্যক্তিদের সমাহিত এবং আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইল। তারপর তিনি আওরঙ্গাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, মুবারিজ খানের জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা আহমদ খান্ হায়দারাবাদ নগরের সন্নিকটবর্তী মাহমুদ নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় মুবারিজ খানের ধন সম্পত্তি স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং ঐ দুর্গের রক্ষী-সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহাকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। মুবারিজ খান যুদ্ধ যাত্রাকালে আহমদ খানকে হায়দরাবাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন।

আওরঙ্গাবাদ রক্ষার যথাবিধি ব্যবস্থা শেষ করিয়া নিজামুল-মল্ক পুনরায় বহির্গত হইলেন। ২৭০ মাইল অগ্রসর হইয়া তিনি হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন। হায়দরাবাদ নগর ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ জনপদগুলি তিনি অধিকার করিয়া লইলেন। হায়দরাবাদ সুবার ভার হীরজুল্লাহ্ খান নামক জনৈক ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া তিনি মছলিবন্দর ও কর্ণাটে চলিয়া যান। মাহমুদনগরের দুর্গে অবস্থিত আহমদ খানের বিরুদ্ধে কিছুদিন তিনি কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিলেন না। এর ফলে এ অঞ্চলে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব হইল। খাজা আহমদ খান ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, তিনি শীঘ্রই সম্রাট কর্তৃক হায়দরাবাদ সুবা ও মাহমুদনগর দুর্গের দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। তাহা ছাড়া তিনি চতুর্দিকে চিঠি পত্র প্রেরণ করিয়া নিজামুল-মুল্কের নিযুক্ত কর্মচারীদিগকে রাজস্ব প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠাইয়া নিজামুল-মুল্কের কর্মচারীদিগের রাজস্ব আদায়ের পথ কণ্টকিত করিয়া দিলেন। কিন্তু নিজামুল-মুল্ক স্বীয় ধৈর্য ও তিতিক্ষা এবং সদাচরণ ও

(৩৩৭ পৃষ্ঠার পর)

বর্ণনা করিতেছেন, লোকে আমাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। আমি তাঁহার জন্য হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতে থাকিতাম।

(تذكرة الحفاظ (১) ১৯৮ পৃঃ)

আবু নঈম বর্ণনা করিতেছেন, আমি আট শত মশায়েখের নিকট হইতে হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

(تذكرة الحفاظ (১) ৩১৬ পৃঃ)

শোয়ায়ব বিন্ হাম্যা অনেক বেশী হাদিছ লিখিয়া ছিলেন। এমাম যুহরী বলিয়া যাইতেন এবং শোয়ায়ব তাহা লিখিয়া লইতেন।

ইমাম আহমদ শোয়ায়ব লিখিত গ্রন্থখানি— দেখিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করিতেছেন শোয়ায়বের গ্রন্থখানি বিশ্বস্ত গ্রন্থ বটে। সন ১৬৩ হিজরী সালে শোয়ায়ব এন্তেকাল করেন। (تذكرة الحفاظ (১) ২১০ পৃঃ)।

আবু আওয়ানা (মৃত ১৬৩ হিঃ) পড়িতে জানিতেন বটে, কিন্তু লিখিতে জানিতেননা। এই হেতু তিনি হাদিছ শ্রবণ করিবার জন্য যখন গমন করিতেন, তখন অপরের নিকট হইতে লিখাইয়া লইতেন। (تذكرة الحفاظ (১) ২১৯ পৃঃ)।

এবনে লাহিয়ার নিকট হাদিছের কতিপয় গ্রন্থ ছিল, এবনে ছালহ বর্ণনা করিতেছেন, আমি ওমরা বিন্ গযবার হাদিছগুলি এবনে লাহিয়ার মূল গ্রন্থ হইতে নকল করিয়া লইয়াছি। সন ১৭৪ হিজরী সালে এবনে লাহিয়া পরলোক গমন করেন।

(تذكرة الحفاظ (১) ২২০ পৃষ্ঠা।

সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ খাজা আহমদকে শত্রুতা পরিহার করিয়া তাঁহার দলভুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। আহমদ খান মাহমুদনগরের দুর্গ নিজামুল-মুল্কের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রতিদানে নিজামুল-মুল্ক তাঁহাকে হায়দরাবাদে প্রচুর জায়গীর, অশেষ ধনরত্ন ও উপহার সামগ্রী প্রদান করিলেন। তাহা-ছাড়া খাজা আহমদ খাঁর উপাধি হইল শাহামত খান এবং খাজা মাহমুদ খানের উপাধি হইল মুবারিজ খান।

বাদশাহ কর্তৃক নিজামুল-মুল্কের অপরাধ মার্জ্জনা

কয়েক মাস পরে যখন দেখা গেল যে, নিজামুল-মুল্ককে নিস্তেজ করা দূরে থাক, তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী শক্তিশালী ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তখন দরবারী চক্রান্তের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য বাধ্য হইয়া অন্য পন্থা অবলম্বিত হইল। লোক দেখান ভাবে নিজামুল-মুল্কের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করা হইল। তদনুযায়ী ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত এক দরবারে নিজামুল-মুল্কের পূর্ব্বপ্রদত্ত সমস্ত জাগীর তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করা হইল, এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাগুলির শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া এক বিশেষ ফরমান প্রেরিত হইল। গুজরাট ও মালওয়া সুবা ২টী অন্যের হস্তে অর্পিত হইল। মালওয়ার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন রাজা গীরধর বাহাদুর, নাগর এবং গুজরাটের শাসনভার পাইলেন সরবুলন্দ খান।

মোহাম্মদ শাহ সমীপে নিজামুল-মুল্কের পত্র প্রেরণ

স্বীয় কার্যকলাপের সমর্থনে নিজামুল-মুল্ক তৎকালে মোহাম্মদ শাহ সমীপে একখানা দীর্ঘপত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তৈমুরের সময় হইতে তুরাণীরা কি প্রকার বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি ও নিমকহালালীর পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহার সবিস্তার বিবরণ প্রদান করিয়া এবং তিনি ও তাঁহার পিতা সম্রাট আলমগীরের কি কি খেদমত করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন। তিনি যে ক্ষমতালাভের জন্য মোটেই লালায়িত নন তাহা প্রমাণের জন্য বলেন যে, তিনি যদি বাস্তবিক উজিরপদের প্রার্থী হইতেন তাহাহইলে মোহাম্মদ আমীন খান চীন উহা—কখনই দাবী করিতেননা। দাক্ষিণাত্যের উপরও যে তাঁহার লোভ নাই, একথা প্রমাণের জন্য তিনি বলেন যে, তাঁহার পুনঃ পুনঃ দিল্লী আগমন উহা মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে। দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাওয়ার কারণ স্বরূপ তিনি বর্ণনা করেন যে, দুষ্টবুদ্ধি ওমরাহদের দুরভিসন্ধি হইতে আত্মরক্ষার জন্যই তিনি উহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সব চক্রান্তকারী ওমারাহদের জন্যই যে মুবারিজ খানের নিকট শাহী ফরমান জারী করা হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ করেন। এতৎসংক্রান্ত পত্রাদি তাঁহার হস্তে নিপতিত হওয়ায় তিনি ঐগুলি ফেরত পাঠাইয়া তাঁহার উপর এইরূপ বীতরাগ ও ক্রোধ কেন বর্ষিত হইতেছে শুধু তাহাই জানার আকাঙ্খা পোষণ করিতেছিলেন। এর পর তিনি বিজাপুর ও হায়দ্রা-বাদ রাজ্যের নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখান যে, সত্যিকার জ্ঞানী ও গুণী পরামর্শদাতা নিযুক্ত করার মধ্যেই বাদশাহের যথার্থ কল্যাণ ও উৎকর্ষতা নিহিত রহিয়াছে। এবিষয়ে অবহেলার ফলে ঈরাণ কি প্রকারে আফগানদের হস্তগত হইয়াছে, তিনি তাহা-রও উল্লেখ করেন। তৎপর সম্রাটের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফেহরিস্ত প্রদান করিয়া মোহাম্মদ শাহের বিলাস ও ব্যভিচার সম্বন্ধেও উহাতে কটাক্ষ করা হয়। তাঁহার সুপরামর্শ, অনুরোধ, উপরোধ উপেক্ষা করিয়া মুবারিজ খান কিভাবে হঠকারিতার সহিত যুদ্ধ করিয়া অগণিত সৈন্যসহ নিজের ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহারও সবিস্তার বর্ণনা উহাতে করা হয়।

এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, এই সময় হইতেই নিজামুল-মুল্ক প্রকারা-ন্তরে স্বাধীন নরপতির ন্যায় দাক্ষিণাত্য শাসন আরম্ভ করেন। দেশ শাসনের জন্য তিনিই কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে থাকেন। জাগীরপ্রদান ও উপাধি বিতরণও তাঁহার ইচ্ছামতই নির্ব্বাহ হইতে থাকে। কিন্তু স্বাধীন নরপতির চিহ্নস্বরূপ রাজছত্র ধারণ, জুমার

খোতবায় তাঁর নামোল্লেখ বা তদীয় নামে মুদ্রা নির্ম্মাণ হইতে তিনি বিরত থাকেন। অনেক জ্যোতিষী তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার ভাগ্যলিপি এত সুপ্রসন্ন যে তিনি ইচ্ছা করিলে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন। কিন্তু উহার উত্তরে তিনি শুধু এই কথাই বলেন—"যাঁহারা রাজছত্র ও রাজসিংহাসনের অধিকারী, তাঁহাদের ভাগ্য বুলন্দ হউক! আমার কাজ হইতেছে আমার আত্মসম্মান বজায় রাখা, রাজসিংহাসনে আমার প্রয়োজন কি?"

গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড ও মালওয়ায় বিশৃঙ্খলা ও উহাদের পতন

এর পর নিজামুল-মুল্ক কিছুকাল সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই কিংবা সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ কোন রাজনৈতিক কার্য্যেও ব্রতী হন নাই। কিন্তু ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্কোচন ও পতন এই সময়েই খুব দ্রুতগতিতে আগাইয়া আসে। উহার চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করিতে গেলে, প্রবন্ধের পরিমাণ অহেতুকরূপে বৃদ্ধি পাইবে। অথচ এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিলে, নিজামুল-মুল্কের জীবনীর শেষ অধ্যায় আলোচনা অনেকটা অপরিস্ফুট ও ধোঁয়াটে হইয়া থাকিবে। তজ্জন্য খুব সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা হইল।

মারাঠাদের লুটপাট ও অত্যাচার মূলতঃ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশেই বহুদিন সীমাবদ্ধ ছিল। কচিৎ কখনও হয়ত সুরাটবন্দর বা সৌরাষ্ট্রের কোন নগরী বা অঞ্চল তাহারা লুটপাট করিয়াছে; কিন্তু তথায় স্থায়ীভাবে উৎপাত করার সাহস বা যোগ্যতা তাহাদের তখনও জন্মে নাই। কিন্তু ১৭২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। ঐ বৎসর ১ম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। ভারত হইতে মুসলমান রাজত্বের উৎখাতের জন্য তিনি একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও সুকল্পিত পরিকল্পনা করেন এবং তার ফল স্বরূপ মারাঠারা নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ হিন্দুস্তানের কেন্দ্রের দিকে শনৈঃ শনৈঃ আগাইতে থাকে। এই বাজীরাও রাজা শাহুকে বলিয়াছিলেন—"এই শীর্ণ ও শুষ্কপ্রায় বৃক্ষের কাণ্ডে এক্ষণে আঘাত দেওয়া থাক, শাখাগুলি আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িবে এবং এইরূপে মারাঠা পতাকা কৃষ্ণা হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইবে।" এই কথা শুনিয়া রাজা শাহুও খুব উৎসাহভরেই বলিয়াছিলেন "আপনি হিমালয়ের চূড়াতেই এই পতাকাদণ্ড প্রোথিত করিবেন।"

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে শকরখেরার যুদ্ধের পর আনুষ্ঠানিকভাবে দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবার শাসনভার নিজামুল-মুল্কের উপর নূতন করিয়া ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু একই সময়ে গুজরাট ও মালওয়ার শাসনভার তাঁহার নিকট হইতে খসাইয়া লইয়া অন্যের উপর অর্পণ করা হয়। ঐ সময় নিজামুল-মুল্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হামীদ খান নিজামুল মুল্কের ডেপুটী স্বরূপ গুজরাট শাসন করিতেছিলেন। হামীদ খানকে দরবারে ফিরিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং মুবারিজুল মুল্ক সরবুলন্দ খানকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। সরবুলন্দ খান স্বয়ং তথায় না গিয়া শুজাআত খান নামক ব্যক্তিকে তাঁহার ডেপুটী নিযুক্ত করিয়া উক্ত সুবা শাসনের বন্দোবস্ত করেন।

কিন্তু হামীদ খান্ গুজরাটের শাসনভার শুজাআত খানের হস্তে সমর্পণ না করিয়া বাহুবলে উহা নিজের কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু একাকী ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। তাই তিনি মারাঠাদের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। ফলে মারাঠাদের অন্যতম প্রধান দলপতি কন্থজী কদম বন্দের অধিনায়কত্বে ১৫০০০ হইতে ২০০০০ মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া হামীদ খানের সহিত মিলিত হইল। এরপর শুজাআত খানের সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতে শুজাআত খান পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় ইবরাহীম কুলী খান ও রোস্তম আলী খান একে একে পরাজয় বরণ করিয়া নির্ম্মমভাবে নিহত হইলেন। এর পর মারাঠারা গুজরাটের সর্বত্র লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা বিশেষ করিয়া সবরমতী নদী তীরস্থ গ্রাম সমূহের আফগান অধিবাসীরা তাঁহাদের রমণীদের বেইজ্জতীর ভয়ে স্বহস্তে তাহাদিগকে বধ করেন। বহু সম্ভ্রান্ত রমণী তাঁহাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজেরাই কূপে পড়িয়া আত্মবিসর্জন দেন। হাহাকারে দেশ ভরিয়া গেল।

প্রতিকারের অন্যকোন উপায় না দেখিয়া বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত গুজরাটের সুবাদার সরবুলন্দ খান নিজে দিল্লী হইতে গুজরাটে অভিযান করিলেন। যোধপুরাধিপতি মহারাজা অভয় সিংহ, নারওয়ারের রাজা ছত্তর সিংহ এবং উদয়পুরের মহারাণার উপর আদেশ দেওয়া হইল, যেন তাঁহারা এই কার্য্যে সরবুলন্দ খানকে যথাবিধি সাহায্য করেন। বহু খণ্ডযুদ্ধের পর হামীদ খান মাহীনদী অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। কিন্তু মারাঠাদের দমন বা উৎখাত করা সহজ সাধ্য ছিল না। কনুজীর সহিত আসিয়া যোগ দিলেন পিলাজী। তাঁহাদের মিলিত সৈন্যদলকে দমন করার জন্য যখন সুবাদারেরা ব্যস্ত, তখন আন্তাজী ও ভাস্করের অধিনায়কত্বে অন্য একটি মারাঠা বর্গীরদল অন্য দিক দিয়া গুজরাট প্রবেশ করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল।

বর্ষা সমাগমে মারাঠারা তাহাদের নিজেদের আবাস ভূমি কন্ধনে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, কিন্তু বর্ষার শেষে আবার নূতন করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিত। মারাঠাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে সরবুলন্দ খান মারাঠাদের সহিত আপোষ করিয়া চৌথ ও সরদেশমুখী প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তবুও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলনা। মারাঠাদের যে দলপতির সহিত সরবুলন্দ খান আপোষ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, উহার প্রতিদ্বন্দীদল এক্ষণে গুজরাটে হানা দিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। দেশে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ ও লুটপাটের ফলে প্রজাকুলের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। ফলে ভূমিরাজস্ব আদায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। এদিকে যুদ্ধবিগ্রহ চালাইবার জন্য সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ব্যয় সঙ্কুলানার্থে সরবুলন্দ খানকে তাই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। প্রথমে দেশের বড় বড় ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জরিমানা স্বরূপ বহু অর্থ আদায় হইল। কিন্তু তাহাতেও আয়-ব্যয়ের সমতা হয়না, তাই ঐ প্রদেশে যত জাগীর ছিল, তাহা তিনি একে একে বাজেয়াফ্‌ত করিতে লাগিলেন।

এই শেষোক্ত কর্ম্মের ফলে বহু আমীর ওমরাহের স্বার্থহানি ঘটিল। তাই তাঁহারা বাদশাহের নিকট সরবুলন্দ খানের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ক্রমাগত অভিযোগ করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া দিল্লীদরবারে খান দওয়ানই সরবুলন্দ খানের প্রধান প্রধান মিত্র ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি ও এক্ষণে খান দওয়ানের উপর বিরক্ত হইলেন। সরবুলন্দ খানকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা নিজামুল-মুল্কের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তির হ্রাস হইবে। কিন্তু তাঁহার সেই আশা ফলবতী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই রহিলনা। এই সমস্ত কারণে তাঁহার স্থলে যোধপুরাধিপতি মহারাজা অভয় সিংহকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করা হইল।

কিন্তু অভয় সিংহ বিনাবাধায় সুবাদারীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেননা। এরজন্য তাঁহাকে সরবুলন্দ খানের সহিত একাধিক প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ভগ্নমনোরথ হইয়া সরবুলন্দ খান একটি আপোষ রফা করিয়া গুজরাটের শাসনভার অভয় সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এরপর মারাঠাদিগকে দমন করার সেরূপ কোন প্রচেষ্টাই হইলনা। ফলে ক্রমশঃ তাহারা সমগ্র গুজরাট তাহাদের কুক্ষিগত করিয়া লইল।

বুন্দেলখণ্ড হস্তচ্যুত হওয়ার সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। বুন্দেলখণ্ড তৎকালীন ইলাহবাদ সুবার অন্তর্গত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সেই সময় ইলাহবাদের সুবাদার ছিলেন মোহাম্মদ খান বন্দশ নামক জনৈক রোহিলা প্রধান। বুন্দেলারা তাহাদের দলপতি রাজা ছত্তর সালের অধিনায়কত্বে বহুদিন হইতে ঐ অঞ্চলে খুব উৎপাত করিতেছিল। তাহাদের এই বিদ্রোহে পেশোয়া বাজীরাও প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া মোহাম্মদ খান বন্দশ ছত্তরসালকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন।

ছত্তরসালের রাজধানী জৈতপুর নগরীর পতনের পর তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার

Contents

রাজ্যের কোথায় কোথায় বাদশাহী কর্মচারী ও সৈন্যদল থাকিবে এই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা ও আলাপ আলোচনা চলিতে থাকে। অবশেষে উহা প্রস্তাবাকারে দিল্লী দরবারে মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করা হয় কিন্তু ৩ মাস ধরিয়া দরবার হইতে কোন নির্দ্দেশ আসেনা। এই দীর্ঘ সময় ছত্তরসাল ও তাঁহার পুত্রেরা মুসলমান শিবিরেই অবস্থান করিতে থাকেন। এদিকে দিল্লীর দরবারে এই ধারণা জন্মিয়া যায় যে মোহাম্মদ খান ও ছত্তরসাল কোন গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে দিল্লীর সিংহাসন হইতে মোগল রাজবংশের উৎখাত করিয়া তথায় কোন পাঠান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই গুজব যে সর্ব্বাংশে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তাহা বুন্দেলাদের কার্য্যকলাপ হইতেই প্রমাণিত হয়। মোহাম্মদ খান বন্দশের প্রতিদ্বন্দ্বী বুরহানুল-মুল্কের নিকট পত্রদ্বারা তাঁহারা নিজেদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ-সূচক পত্র পাওয়া যায়। অন্যান্য বহু আমীর ওমরাহ ও মোহাম্মদ খান বন্দশের বিরুদ্ধপার্টি কত প্রবল, তাহার প্রমাণ এই ভাবে প্রাপ্ত হইয়া ছত্তরসাল আবার উৎসাহিত হইয়া উঠেন এবং পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইবার জন্য মনস্থ করেন। হোলি উৎসবের অজুহাত দেখাইয়া তিনি মুসলমান শিবির হইতে ৬।৭ মাইল দূরে প্রস্থান করেন। এদিকে মোহাম্মদ খান বন্দশও দেশের অবস্থা শান্ত দেখিয়া অধিকাংশ সৈন্য-সামন্তকে-ছুটি উপভোগ করার অনুমতি দিয়াছিলেন।

এদিকে গোপন চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী পেশোয়া বাজীরাও স্বয়ং বহু মারাঠা সৈন্য লইয়া হঠাৎ বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিয়া মোহাম্মদ খান বন্দশের শিবিরের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মারাঠারা চারিদিকের চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। অচিরে বন্দশের শিবিরে দারুণ খাদ্যাভাব ঘটিল। তাঁহার নিকট যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল তাহা লইয়া মারাঠাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া চলেনা, কিংবা তাহাদের ব্যূহভেদ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়াও অসম্ভব। ইতিমধ্যে যে সব বুন্দেলা-সৈন্য পর্ব্বতে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিল, তাহারা দলে দলে ফিরিয়া আসিয়া মারাঠাদের সহিত যোগ দিল। মোহাম্মদ খান বন্দশ এই ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া সঙ্কটজনক অবস্থায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ কাতর আবেদন দিল্লীর দরবারে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরবার যে তাঁহার উপর কিরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দরবার হইতে কোন সাহায্যই আসিলনা! উপরন্তু খান দওরাণ ছত্তরসালের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি যদি বন্দশের খণ্ডিত শির দিল্লীতে প্রেরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বাদশাহ অতীব সন্তুষ্ট হইবেন এবং ছত্তরসালকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবেন।

মোহাম্মদ খান বন্দশ উপয়ান্তর না দেখিয়া ছত্তরসালের সহিত সন্ধি করিয়া বুন্দেলাখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি যে আর দ্বিতীয়বার ছত্তর-সালের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞাও তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

মারাঠারা তাহাদের সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ ছত্তর-সালের নিকট হইতে তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলের এক তৃতী-য়াংশ পাইল। এই ভাবে যে সমস্ত পরগণা মারাঠাদের অধিকারভুক্ত হইল, সেগুলি বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ ও পশ্চিম-দিকে অবস্থিত এবং তৎকালে ঐগুলি হইতে ৩০৭৬৮৫৩৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড হইতে এই ভাবে পরাস্ত হইয়া মোহাম্মদ খান বন্দশ দিল্লী আসেন। মালওয়ার সুবাদার গিরিধর বাহাদুর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় ঐ পদটী তখনও খালি পড়িয়াছিল। মারাঠাদের অত্যাচারে ঐ সুবার যে অসহনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে ঐ পদের বিশেষ কেহ প্রার্থী ছিলেননা। ইলাহবাদ সুবার আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অবশেষে মোহাম্মদ খান বন্দশ এই মহা বিপজ্জনক মালওয়া সুবার সুবাদারী প্রার্থনা করিলেন। দরবারের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী আমীর জাফর খান রওশন উদ্দৌলাহ্ পানিপতি ও বাদশাহের দুধভগ্নি বলিয়া পরিচিতা রহিমন্নেছার বদৌলতে মোহাম্মদ খান বন্দশ মালওয়ার সুবাদারী প্রাপ্ত— হইলেন। (১৭৩০ খৃষ্টাব্দ)।

খান বন্দশ গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর মালওয়ার শাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ১ম বৎসরেই একের পর এক যুদ্ধে তিনি মারাঠাদিগকে পরাস্ত

করিয়া উজ্জয়িনী, মণ্ডলেশ্বর, ধর ও দিপালপুর অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন। নর্ম্মদার তীরে মারাঠারা যে সব ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেগুলিও উৎখাত করা হইল।

উক্ত বৎসরেই নর্ম্মদাতীরে আকবরপুর দেবীঘাটে তিনি নিজামুলমুল্কের সহিত মিলিত হইলেন। মারাঠাদের দুই প্রধান দলপতি পিলাজী গাইকোয়াড় ও উদাজী পুয়ার তৎকালে পোশোয়া বাজীরাওএর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পেশোয়াকে দমনের উপলক্ষে মুসলমান পক্ষের সহিত একটি গোপন সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মিত্রতায় খান বঙ্গশকে শুদ্ধ আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই নিজামুল-মুল্ক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে উভয়ে একযোগে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

কিন্তু নিজামুল-মুল্কের এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায়—পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত হইতেছে এইরূপ আভাষ পাইয়াই পেশোয়া বাজীরাও ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া পিলাজী গাইকোয়াড় ও উদাজী পুয়ারকে আক্রমণ করেন। পিলাজী প্রভৃতি আহত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু শীঘ্রই উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়।

কিন্তু নিজামুল-মুল্কের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য খান বঙ্গশের ভাগ্যে আবার শীঘ্রই বিপর্য্যয় নামিয়া আসিল। এইরূপ জনরবই শুনা যায় যে মোহাম্মদ খান বঙ্গশকে মালওয়ার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করার অন্যতম শর্ত্তই ছিল যে, তিনি যেন নিজামুল-মুল্কের দমনের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া দূরে থাক, তাঁহারা উভয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া মতের আদান প্রদান করিলেন। সুতরাং খান বঙ্গশের এত বড় অপরাধ কি করিয়া উপেক্ষা করা যায়?

শীঘ্রই মারাঠারা পুনরায় নবোদ্যমে দলে দলে মালওয়া আক্রমণ করিল। উহাদিগকে দমনের জন্য খান বঙ্গশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সুবা হইতে বিশেষ রাজস্বও আদায় হয় নাই। বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া দেশের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীরা রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিয়া দেয়। বিনা যুদ্ধবিগ্রহে তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের কোন সম্ভাবনা ছিলনা। তাই তিনি অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণের কাতর আবেদন জানাইয়া পুনঃ পুনঃ দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, নেতৃত্বের জন্য নূতন লোক প্রেরণ করিলেও তিনি সম্মত আছেন। তিনি ঐ নবনেতার অধীনে থাকিয়াই মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবেন। কবি সাদীর বাণী উদ্ধৃত করিয়া তিনি জানাইলেন যে, ঐ সময় যদি মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিহত করা না হয় তাহাহইলে অচিরে উহা প্রবলাকার ধারণ করিয়া সমগ্র উত্তরভারত গ্রাস করিবে।

কিন্তু দরবার হইতে কোন সাহায্যই আসিলনা। উপরন্তু গুজব রটিয়া গেল যে, ঐ প্রদেশের জন্য শীঘ্রই নূতন সুবাদার আসিতেছেন। শীঘ্রই বাদশাহের স্বহস্তলিখিত ফরমান খান বঙ্গশের নিকট হাজির হইল। উহাতে লিখিত ছিল যে, অম্বরের রাজা জয়সিংহকে ঐ প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে। খান বঙ্গশ যেন অবিলম্বে উক্ত রাজার হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিয়া আগ্রায় আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত ফরমানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর খান বঙ্গশ মহারাজাকে শাসনভার বুঝাইয়া দিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

জয়সিংহের হস্তে সুবাদারী ন্যস্ত হওয়ার পরেই মারাঠাদের মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি লোক দেখান ভাবে কিছুকাল মারাঠাদের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিলেন। জয়সিংহ প্রকাশ করিলেন যে, মারাঠাদের সহিত বৃথা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া রক্তপাতের প্রয়োজন কি? তারচেয়ে তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বশীভূত করাই বুদ্ধিমত্তার কার্য্য। তাঁহার পরম মিত্র সামসামউদ্দৌলাহ যিনি তৎকালে দিল্লী দরবারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী আমীর ছিলেন, তাঁহার অভিমতকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাইলেন। তদনুযায়ী রাণুজী সিন্ধিয়া, মালহার হোল্‌কার, যশোবন্ত রাও পুয়ার ও অন্যান্য মারাঠা প্রধানদের সমভি-

ব্যাহারে বাজীরাও ঢোলপুরে রাজা জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় এই মর্ম্মে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল যে, মারাঠারা আর মোগল-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে লুটপাট করিবেনা। ইহার প্রতিদানে বাজীরাওকে মালওয়ার ডেপুটী গভর্ণর নিযুক্ত করা হইল। এই ভাবে শাহীপক্ষের মুখরক্ষা হইল। কিন্তু শুধু উহাই সার। ইহার ফলে মালওয়ার কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়া তাহারা অবিলম্বে উত্তরভারতের অন্যান্য দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আপোষ নিষ্পত্তিতে কোন দিনই তাহারা আস্থা স্থাপন বা উহাকে গুরুত্ব প্রদান করে নাই বরং উহাকে বাদশাহপক্ষের দুর্ব্বলতা বলিয়া ধরিয়া লইয়া নূতন নূতন দাবী উপস্থাপিত করার সুযোগরূপে ব্যবহার করিত। সেই সব কথাই আমরা এর পর আলোচনা করিব।

রাজা জয়সিংহকে মালওয়ার সুবাদার নিযুক্ত করা হইতে প্রমাণিত হয় যে, দিল্লীর দরবারে তৎকালে যে শ্রেণীর লোক আধিপত্য করিতেছিল, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা অত্যন্ত সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ও বিসর্জ্জন দিয়াছিল। খান বঙ্গশের পূর্ব্ববর্ত্তী সুবাদার গিরিধর বাহাদুর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দয়া বাহাদুর মারাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। সেই সময় রাওসাহেব নন্দলাল মণ্ডালয় নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী মালবী চৌধুরী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মারাঠাদিগকে সাহায্য করেন। তারফলে দয়া বাহাদুর নিহত হইলেন, এবং অন্যান্যভাবে শাহীপক্ষ বিপর্য্যস্ত হইল। এহেন সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা জয়সিংহ নন্দলালকে সাদর অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"তুমি এইভাবে মুসলমানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া মালওয়াতে আমাদের পবিত্র ধর্ম্মকে শুধু যে রক্ষা করিয়াছ তাহা নয়, উহাকে তথায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তুমি আমার গোপন ইচ্ছাকেই পূরণ করিয়াছ।" রাজা জয়সিংহের এবম্বিধ মনোভাবের কথা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সেখানে তাঁহাকেই সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হইল এবং তাহার ফল যে কিরূপ বিষময় হইবে তাহা অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। ক্রমশঃ

নয়া সমাজ

—আতাউল হক

ঈমান ও আখ্‌লাক মানুষের অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ ব্যতিরেকে মানুষ কখনই আপনাকে "আশ্‌রাফুল মখ্‌লুকাত" বা সৃষ্টির মুকুট-মণি রূপে বিকশিত ক'রে তুলতে পারেনা। এই স্বর্গীয় সম্পদই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিনবত্ব দান করেছে। এই সম্পদ সহজলভ্য নয়, সাধনা ক'রে একে আয়ত্ব করতে হয়। সাধনায় জয়ী হ'লে এই সম্পদ মানুষকে সৃষ্টি-জগতের সম্রাট ক'রে তোলে। এরই সাধক 'মোমেন' আর এই 'মোমেন'ই আল্লাহ্‌তা'লার ঈপ্সিত মানুষ। মোমেনের জীবন চির-পবিত্র। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি 'মোমেন' হ'ত তবে এই মোমেনের স্পর্শে ধূলার ধরণী বেহেশ্‌তে পরিণত হ'ত!

কিন্তু আজকাল আমরা যে সমস্ত মানুষ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাদের ক'জনকে "মোমেন" বা "আশ্‌রাফুল মখ্‌লুকাত" বলা যেতে পারে? বিশ্ব-মানবের নিখুঁত আদর্শরূপে বিশ্বপতি আল্লাহ্‌তা'লা বিশ্ব-নবী হজরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) কে বিশ্বের বুকে সৃষ্টি করেছিলেন; তাঁর ভেতর আমরা যে স্বর্গীয় ঈমান ও আখ্‌লাকের সন্ধান পাই, সেই স্বর্গীয় সম্পদ আজ কোথায়? ক'জন মানুষ আজ সেই বিশ্বগুরুর স্বর্গীয় গুণাবলীর অনুকরণে যত্নবান? অন্য জাতীয় লোকদের ত কথাই নেই, তাঁর উম্মতগণ পর্য্যন্ত আজ তাঁর প্রতি বেদনাদায়কভাবে উদাসীন। বিধর্ম্মী এবং ভ্রান্তদের সংস্পর্শে এসে এরা আজ পথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছে। এর বিষময় ফল স্বরূপ আজ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি; সর্ব্বগ্রাসী দোজখের লেলীহান বহ্নি-শিখা আজ লক্‌ লক্‌ ক'রে উঠ্‌ছে আমাদের ঘরে-বাইরে! আমরা আজ নামমাত্র 'মানুষ'! প্রকৃত মানুষের সৌন্দর্য্য আমাদের অন্তর থেকে বিদায় নিয়েছে।

খুবই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মানুষ স্বীয় চেষ্টায় এই পৃথিবীতে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করছে; কিন্তু ঈমান ও আখ্‌লাকের অধিকারী হ'তে কাউকেও সংকল্পবদ্ধ

হতে দেখিনা। মানবজীবনে এই বেহেশ্‌তী পারিজাতের কোন প্রয়োজন আছে ব'লেও আমরা মনে করিনা। অশিক্ষিত ও অসভ্য লোকেরা এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু বহু শিক্ষিত লোকের ঈমান ও আখ্‌লাক দেখলেও বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয়। অন্য দেশের কথা বলতে চাইনে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকজনের অধিকাংশই যে এই স্বর্গীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত, তা কোন যুক্তি প্রমাণের অবতারণা না ক'রেও বলা যেতে পারে! তাদের আচরণকে কখনই "আশ্‌রাফুল মখ্‌লুকাতে"র আচরণের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলেনা।

আজ সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতিতে আমাদের দেশ সমাচ্ছন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের শিক্ষিত লোকেরাও দুর্নীতি-পরায়ণ হ'তে লজ্জা বোধ করেননা—তাঁদের পরিপক্ক হস্তেই বরং আজ দুর্নীতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ঘুষ-খোরের অত্যাচারে আজ অসহায় দেশবাসী জর্জ্জরিত। উৎকোচ না হ'লে আজ কোন কাজ করাই সম্ভবপর হচ্ছেনা। চৌর্য্য, ভণ্ডামী, লাম্পট্য, স্বার্থপরতা, মানসিক সঙ্কীর্ণতা, দুরভিসন্ধি প্রভৃতিতে পাকিস্তান আজ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে! সামান্য স্বার্থের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তি আজ সকুণ্ঠিত চিত্তে শিক্ষার মহত্বকে পদতলে নিষ্পেষিত ক'রে চল্‌ছেন। শিক্ষার একী বীভৎস পরিণাম!

এটা খুবই পরিতাপের কথা! শিক্ষিত লোকের ঈমান ও আখ্‌লাক যদি মানবোচিত না হয়, তবে ঈমান ও আখ্‌লাক আশা করব আমরা কা'র নিকট থেকে? আজ আমাদের শিক্ষিত জনসাধারণের চারিত্রিক অবনতি দে'খে আমরা নিরাশ হয়েছি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছি। শিক্ষিত লোকের চারিত্রিক অবনতি যে আজ মহামারীরূপে আমাদের দেশে দ্রুতগতিতে সংক্রামিত হ'য়ে পড়ছে, একথা অনস্বীকার্য্য। এই সর্ব্বনাশা সংক্রামক ব্যাধি কোন্ বীজাণুর সাহায্যে বিস্তৃত হচ্ছে এবং কোন্ নর্দ্দমার দূষিত জলে বা আঁস্তাকুড়ে এরা জন্মলাভ করেছে তার নিদান এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা অতি শীঘ্র আবিষ্কৃত না হ'লে আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তা বলাই বাহুল্য।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে সর্বপ্রথম এর যে দুটি কারণ আমাদের নজরে পড়ে তা এই: ১। কোরআনের মহান শিক্ষা ও ছুন্নাহ্ থেকে দূরে অবস্থিতি এবং ২। (ক) বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর অপূর্ণতা, (খ) শিক্ষকগণের অযোগ্যতা ও (গ) শিক্ষার্থীর শৈথিল্য। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশও একটি প্রধান কারণ, সন্তান-সন্ততির চরিত্র গঠনে পিতামাতার অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তা চিরকালই আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই আদর্শস্থানীয় ন'ন্। ভাল-মন্দ বিচার না ক'রে আমরা প্রায়ই অন্য জাতির অনুকরণ ক'রে থাকি; এই ধরণের অনুচিকীর্ষাবৃত্তি আমাদেরকে অধঃপতনের চরম সীমায় এনেছে। এগুলো ছাড়াও বহু অপরিহার্য্য কারণ বিদ্যমান আছে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শীঘ্রই সেই কারণ-গুলোর সন্ধানে অগ্রসর হওয়া দরকার।

দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের কথা সকলেরই জানা আছে। এরা ঈমান ও আখলাক থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। গ্রামের গোয়েন্দারা নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর ঘৃণ্য জানোয়ারে পর্য্যবসিত। এদের অমানুষিকতায় সোনার পল্লী আজ কবরস্তানে পরিণত।

যে-দেশের অধিবাসীর চারিত্রিক পরিণতি এরূপ বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক, সেই অভিশপ্ত দেশে পাকি-স্তানের মত বিশ্ব-বেহেশ্‌তের প্রতিষ্ঠা করা যে কত বড় কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। যে-আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, এদের জ্বালাময়ী নিঃশ্বাসে তা দাঙ্গিভূত হ'বে কিনা, কে জানে? রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি সজাগ না হ'ন, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার চারিত্রিক সুষ্ঠতা, পূর্ণতা ও বলিষ্ঠতা সম্পাদনে যদি তাঁরা ব্রতী না হ'ন এবং তাঁহারা নিজেরাও যদি সত্যিকার ঈমান ও আখ্‌লাকের অধিকারী হতে না পারেন, তবে এ-রাষ্ট্র আর যা-ই হো'ক, আমাদের ঈপ্সিত রাষ্ট্ররূপে যে কখনই গ'ড়ে উঠ্‌বেনা, এ কথা জোর ক'রেই বলা যেতে পারে।

এখন সকলেরই সজাগ হওয়ার সময় এসেছে। অব্যর্থ ওষুধ আমাদের সামনে প্রতীক্ষমান; অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করলেই সকল ব্যাধির অবসান হ'য়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে গ'ড়ে উঠ্‌বে সুস্থ ও সবল দেহ, যার চোখ-জুড়ান লাবণ্যে পাকি-স্তান ত দূরের কথা, পৃথিবীরই মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌বে!

বলা বাহুল্য, কোরআন ও হাদীছের দিকেই আমি ইংগিত করছি।

المباحثة المنطقية
বিতর্ক ও বিচার

দুযখের অবিনশ্বরত্ব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কোরআনের যেসকল আয়তে দুযখীদের দুযখবাস ও বেহেশ্‌তীগণের বেহেশ্‌তবাসের মুদ্দতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল আয়তের মধ্য হইতে কয়েকটি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

ছুরত আলবাইয়েনায় কথিত হইয়াছে যে, গ্রন্থধারী ও মুশ্‌রিকদলের মধ্যে যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহারা নিশ্চিতরূপে নরকের আগুনে 'খালিদ' হইবে ! তাহারা নিকৃষ্টতম জীব (আর) যাহারা ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং সদাচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারা সর্বোত্তম জীব। তাহাদের পুরস্কার হইবে তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে বাসস্থানের উদ্যান, যাহার নিম্নদেশ দিয়া স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিতা, তাহারা উহাতে অনন্তকালের জন্য চিরবাস করিবে—৬, ৭ ও ৮ আয়ত।

ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم' خالدين فيها' اولائك هم شرالبرية - ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خيرالبرية' جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتهاالانهار خالدين فيها ابدا -

এই আয়তের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুযখীদের দুযখবাসের সমকক্ষতায় বেহেশ্‌তীদের বেহেশ্‌তবাসকে ত্রিবিধ শব্দ দ্বারা যোরদার করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম বলা হইয়াছে 'আদ্‌ন' অর্থাৎ অবস্থান ও বাস, তারপর বলা হইয়াছে 'খালেদীন' অর্থাৎ চিরবাস, সর্বশেষে এই চিরবাসকে 'অনন্তে'র বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। অথচ আয়তের সূচনায় দুযখীদের বেলায় শুধু দুযখে চিরবাসের উল্লেখ যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছে। ছুরত-আত্‌তাগাবুনে অনুরূপ ভাবে বলা হইয়াছে যে, তাহাকে এরূপ বাগীচায় প্রবেশ করান হইবে যাহার নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, উহাতে তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া চিরবাস করিবে এবং ইহা বিরাট সার্থকতা আর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের উক্তিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে তাহারাই নারকী, তাহারা উহাতে চিরবাস করিবে—৯ ও ১০ আয়ত।

و يدخله جنات تجرى من تحتهاالانهار خالدين فيها ابدا' ذلك الفوز العظيم' والذين كفروا وكذبوا بايا تنا اولائك اصحاب النار خالدين فيها -

এস্থানে লক্ষ করা উচিত যে, এই দুই আয়তে বেহেশতীদের জন্য 'খলুদ' ও 'আবাদীয়তে'র প্রতিশ্রুতির সমকক্ষতায় দুযখীদের জন্য শুধু 'খলুদ' উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ দুযখীদের শাস্তির সীমাহীন হওয়া উল্লিখিত হয় নাই কিন্তু বেহেশতীদের 'খলুদ'-কে অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। একই আয়তে পুরস্কার ও দণ্ডের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি একেবারেই অর্থহীন ?

ছুরত আলে-ইমরাণে বেহেশ্‌তীদের বেহেশ্‌তে চিরবাস স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারিত হইলেও দুযখীদের শাস্তির মুদ্দত সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে মৌনাবলম্বন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যেদিন কতক বদন শুভ্র আর কতক কৃষ্ণবর্ণ

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه' فاماالذين اسودت وجوههم' اكفرتم بعد

হইবে, সেদিন যাহাদের মুখ কালো, তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, তোমরা কি ঈমান স্থাপন করার পর পুনরায় কাফির হইয়া গিয়াছিলে? তাহাহইলে কুফরের বিনিময়ে দণ্ডের আস্বাদ গ্রহণ কর আর যাহাদের বদন শুভ্র, তাহারা আল্লাহর রহমতে প্রবেশ এবং উহাতে চিরবাস করিবে—১০৬ ও ১০৭ আয়ত।

ايمانكم' فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون' و اماالذين ابيضت وجوههم' ففى رحمة الله' هم فيها خالدون ـ

এই আয়তে শাস্তির সীমা সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করা হইয়াছে কিন্তু রহমতকে 'খুলদে'র সহিত—বিশেষিত করিয়া উহাকে অবারিত ও সীমাহীন রাখা হইয়াছে।

ছুরত আন্‌নিছার ৫৬ আয়তে কথিত হইয়াছে, বস্তুতঃ যাহারা আমার নির্দশনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে, অচিরাৎ আমরা তাহাদিগকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইব। যখন তাহাদের দেহের ত্বক বিগলিত হইবে তখন আমরা অন্য ত্বক তাহাদের জন্য পরিবর্তন করিয়া দিব যাহাতে তাহারা দণ্ডের আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও প্রজ্ঞাশীল। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সদাচারণের অনুষ্ঠান করিয়াছে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে এমন বাগীচাসমূহে প্রবেশ করাইব যেগুলির নিম্নদেশ দিয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহারা উহাতে অনন্তকাল ধরিয়া চিরবাস করিব।

ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا' كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ـ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ـ

এই আয়তেও কাফিরদের দুযখ বাস এবং মু'মিনগণের বেহেশ্‌ত-বাসের কথা যুগপৎভাবে আলোচিত হইয়াছে। অথচ দুযখের চিরবাস অথবা অনন্তস্থায়ী শাস্তির কোন উল্লেখ এই আয়তে নাই, পক্ষান্তরে উহার সমকক্ষতায় বেহেশ্‌তীদের জন্য বেহেশ্‌তে অনন্ত চিরবাসের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। দুযখের শাস্তি ও বেহেশ্‌তের পুরস্কারের একইস্থানে বর্ণনা পদ্ধতির যে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা একদম উড়াইয়া দেওয়া কি সম্ভবপর?

উক্ত ছুরতেরই ১২১ আয়তে কাফির ও মুশরিকগণের ক্ষমাহীন শিরকের অপরাধের কথা আলোচনা করার পর তাহাদের দুযখবাস সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে যে, তাহাদের বাসস্থান হইবে দুযখ এবং উক্ত দুযখ হইতে তাহারা পলায়ন করার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হইবেনা। অথচ বেহেশ্‌তীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সদাচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব, যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহমান। তাহারা উহাতে অনন্তকালের জন্য চিরবাস করিবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ধ্রুবসত্য এবং আল্লাহর অপেক্ষা কাহার কথা অধিকতর সত্য হইতে পারে?—আন্‌নিছা, ১২২ আয়ত।

اولائك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ـ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا' وعدالله حقا' ومن اصدق من الله قيلا؟

উল্লিখিত আয়তের বর্ণনা পদ্ধতি সাবধানতার সহিত লক্ষ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দুযখীরা দুযখ হইতে পলায়ন করিতে পারিবেনা কিন্তু বেহেশ্‌তীরা বেহেশতে অনন্তকাল ধরিয়া চিরবাস করিবে। এই স্থানেও বেহেশতের মত দুযখকেও অনন্ত ও চিরবাসের স্থানরূপে অভিহিত করা হয়নাই।

ছুরত আত্‌তালাকে আল্লাহর এবং তদীয় রছুলগণের বিদ্রোহীদল সম্পর্কে যেস্থলে বলা হইয়াছে, আমরা তাহাদের নিকট হইতে কঠোর হিসাব গ্রহণ করিব এবং অজ্ঞাতপূর্ব শাস্তি তাহাদিগকে দান করিব, অতএব তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদ করিবেই এবং তাহাদের

وكاين من قرية عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ـ و كان عاقبة امرها خسرا' اعدالله لهم عذابا شديدا ـ

কর্মের পরিণতি সর্বনাশকর হইবে। আল্লাহ প্রস্তুত রাখিয়াছেন তাহাদের জন্য কঠোর দণ্ড—৮, ৯ ও ১০ আয়ত।

ইহার পরে পরেই বেহেশ্‌তীদের সম্বন্ধে বলা হইতেছে, যাহারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হইয়াছে এবং সদাচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে এরূপ উদ্যানমালায় প্রবেশ করাইবেন, যাহার নিম্নভাগে নহর সমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহারা উহাতে অনন্তকাল চিরবাস করিবে—ঐ ১১ আয়ত।

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا -

এ স্থানেও বেহেশতীদের সীমাহীন ও অনন্ত স্বর্গবাসের সমকক্ষতায় দুযখীদের অনন্ত নরকে স্থায়ী হইবার কথা আদিষ্ট হয়নাই। শুধু তাহাদের দণ্ডের কঠোরতার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই তারতম্য প্রণিধান যোগ্য নয় কি?

একথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোরআনে দুযখবাসের জন্য "খালেদীনা ফিহা আবাদা" বাক্যটি ছুরত আল আহযাবের ৬৪ আয়তে, ছুরত আলজিন্নের ২৪ আয়তে ও ছুরত আন্‌নিছায় ১৬৯ আয়তে মোট তিন স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু কোন স্থানেই বেহেশ্‌তবাসের সমকক্ষতায় এই আয়তগুলি উল্লিখিত হয় নাই এবং ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্বেই নিবেদন করা হইয়াছে যে, এক দল বিদ্বান এই 'সীমাহীন চিরবাস'কে আল্লাহর আদেশক্রমে দুযখের বিধ্বস্তিকাল পর্যন্ত চিরস্থায়ী বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বেহেশতবাসের জন্য 'খালেদীনা ফিহা আবাদা' বাক্যটি আলবাইয়েনাহ, আততাগাবুন, আন্‌নিছার দুই স্থানে আলমায়েদা, আত্‌তওবার দুই স্থানে এবং ছুরত আত্‌তালাকে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সংখ্যার এই তারতম্যও বিদ্বানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

কয়েকটি আয়তে দুযখবাসকে শুধু 'খলুদ' দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে, কিন্তু শুধু 'খলুদে'র সাহায্যে অনন্ত স্থায়ী প্রমাণিত না হওয়া ডক্টর—শহীদুল্লাহ ছাহেব অবশেষে অনুগ্রহপূর্বক মানিয়া লইয়াছেন। অধিকন্তু উহার সমকক্ষতায় কোরআনের অন্ততঃ কুড়িটি আয়তে বেহেশতীদের—জন্যও 'খলুদ' শব্দ প্রযোজ্য হইয়াছে। এই সংখ্যার তারতম্য কি সম্পূর্ণ অর্থহীন? আর মু'মিন মুছলমানদের জন্যও দুযখের শাস্তি সম্বন্ধে 'খলুদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ছুরত আন্‌নিছার ৯৩ আয়তে কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিবে, তাহার শাস্তি হইতেছে দুযখ, উহাতে সে 'খালেদান' বাস করিবে।

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها !

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আনুসংগিক ইংগিত না পাওয়া পর্যন্ত 'খলুদ' শব্দের চিরস্থায়ী হওয়ার অর্থ গৃহীত হইবেনা। কোরআনের অন্ততঃ কুড়িটি আয়তে বেহেশতীদের 'খলুদ' সম্পর্কে আনুসংগিক ইংগিত বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহাদের বেহেশতবাস নিরবচ্ছিন্ন ও অনন্ত হইবে। সুতরাং এই কুড়িটি আয়তের সাহায্যে বেহেশতীগণের বেহেশতে চিরস্থায়ী হইয়া অনন্তকাল বাস করা সাব্যস্ত হইতেছে।

দুযখের শাস্তি সম্পর্কে ছুরত আল-ইন্‌ফিতারে বলা হইয়াছে, "দুযখীরা দুযখ হইতে লুকাইয়া বাঁচিতে পারিবে না।" ছুরত-আল বাকারায় কথিত হইয়াছে, দুযখীরা সৎকার্যের অনুষ্ঠানের জন্য পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসার কামনা করিবে কিন্তু "তাহারা দুযখ হইতে বহির্গত হইতে পারিবেনা।" ছুরত-আলমায়েদা, ছুরত-আলহজ্জ ও ছুরত-আছ্‌ছিজ্‌দায় উক্ত হইয়াছে যে, দুযখীরা বারংবার দুযখ হইতে বহির্গত হওয়ার চেষ্টা করিবে কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার দুযখেই প্রত্যাবর্তন করিবে।

এই সকল আয়তকে দুযখের অবিনশ্বরত্বের—প্রমাণরূপে উপস্থিত করা আমি সংগত মনে করিনা। কারণ এই সকল আয়তের কোন একটিতেও দুযখের অবিনশ্বরতার উল্লেখ নাই। দুযখীরা শাস্তির যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কোন স্থানে লুকায়িত থাকিয়া উহার কষ্ট হইতে বাঁচিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু ইহা

তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবেনা—প্রথম আয়তে শুধু এই কথাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু ইহা দ্বারা দুযখের চিরস্থায়ী হওয়া প্রমাণিত হয় কি?

দ্বিতীয় আয়তের তাৎপর্য এই যে, যে সকল পার্থিব আচরণের দণ্ড স্বরূপ কাফির ও মুশরিকের দল নিরয়গামী হইবে তাহারা সদাচরণের সাহায্যে সেগুলির প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দুনিয়ায় ফিরিয়া আসার আকাংখা করিবে কিন্তু তাহাদের এই আকাংখা কিছুতেই পূরণ হইবেনা, ইহা পুনর্জন্মবাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হইলেও এই আয়তের সাহায্যে আল্লাহ যে দুযখকে বিধ্বস্ত করিতে পারেননা তাহা প্রমাণিত হয় কি?

অবশিষ্ট আয়তগুলির অর্থ হইতেছে, দুযখীরা দুযখের দণ্ড ভোগ করিতে করিতে যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে তখন দল বাঁধিয়া দুযখ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবার সংকল্প করিবে কিন্তু সকল সময়েই তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইবে।

দুযখের বিদ্যমানতা পর্যন্ত দুযখীদের দুযখ হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও আল্লাহ যদি দুযখকে লক্ষ কোটি বৎসর প্রজ্জ্বলিত রাখার পর উহাকে নিষ্প্রভ করার পবিত্র ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহাহইলে তিনিও কি সফলকাম হইতে পারিবেননা?

ছুরত হূদের যে বহুবিশ্রুত আয়তটি বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ 'ইল্লা মাশাআ রাব্বোকা'—আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত। এই নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ তাঁহার পবিত্র ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করিতে সমর্থ। ডক্টর শহীদুল্লাহ ছাহেব বলিয়াছেন আল্লাহর এই ইচ্ছার উপর আস্থাশীল হওয়া আমার সঠিক হয় নাই। আমি বলিব, এই অর্থই সঠিক, কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দণ্ড দিবেন, উর্ধ গগনসমূহ এবং বসুন্ধরা এবং এসমস্তের মধ্যবর্তী সমুদয় বস্তুর সর্বাভৌম প্রভুত্বের একমাত্র অধিকারী তিনিই এবং তাঁহারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন—আল্ মায়েদা ১৮ আয়ত।

يغفر لمن يشاء و يعذب
من يشاء، و لله ملك
السموات والارض وما
بينهما واليه المصير—

ছুরত আল্ মায়েদার যে আয়তে কথিত হইয়াছে যে, আল্লাহ শিরকের অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করিবেননা এবং শির্ক ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় অপরাধ, যাহার জন্য ইচ্ছা করিবেন, তিনি ক্ষমা করিবেন—তাহার তাৎপর্যের কোন স্থানেই এ কথার উল্লেখ নাই যে, আল্লাহ দুযখকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইবেননা।

"আর আল্লাহর আয়ত সমূহকে যাহারা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয় এবং গর্ব ভরে তাহা মান্য করিতে অস্বীকৃত হয়, সূচের ছিদ্র দিয়া উষ্ট্র অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাহাদের জন্য যে উর্ধ জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবেনা" ছুরত আল্ আ'রাফের এই উক্তি সত্যই অত্যন্ত ভয়াবহ, কিন্তু কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত উহাদিগকে গলাধঃকরণ করার জন্য দুযখকেই আদেশ দেওয়া হইবে। কিন্তু যুগযুগান্তর এবং অগণিত হুকবার পর এই সকল হতভাগ্যকে আল্লাহ যদি দয়া প্রদর্শন করেন এবং শেষ পর্যন্ত দুযখের আগুন নিভিয়া যায়, তাহাতে ডক্টর ছাহেবের উদ্বিগ্ন হইধার কারণ কি? ডক্টর ছাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, দুযখীরা যদি পৃথিবীতে ঘুরিয়া না যাইতে পারে আর বেহেশ্তের দ্বারও যদি তাহাদের জন্য রুদ্ধ থাকে, তাহাহইলে দুযখের বিধ্বস্তির পর তাহাদের কি গতি হইবে? আমি তাঁহাকে সসম্মানে আশ্বস্ত করিতে চাই যে, দুযখীদের পরিণামে কি হইবে তজ্জন্য তাঁহার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই?

"আলমে-গায়েবে"র যে সকল ব্যাপারকে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছার সহিত যুক্ত রাখিয়াছেন, সেগুলির জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনই স্বার্থকতা নাই। আমার বক্তব্য শুধু ইহাই যে, দুযখের অবিনশ্বরতার কোন অকাট্য প্রমাণ কোরআন ও ছুন্নতে ছহীহায়—আমি প্রাপ্ত হইনাই আর আল্লাহর রহমতে আশান্বিত থাকার জন্য বহুভাষাবিদ জনাব ডক্টর শহীদুল্লাহ এম-এ, ডি-লিট আমাকে যে ভৎর্সনা করিয়াছেন তদুত্তরে আমি আরয করিতে চাই যে, এরূপ আশা পোষণ করার দরুণ আমি কি ইবলীছেরও অধম হইয়া গিয়াছি? ডক্টর ছাহেব কি শেইখ ছা'দীর

কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ?

وگر در دهد یک صلائے کرم
عزازیل گوید نصیبے برم !

আল্লাহ যদি কৃপা বিতরণ করিবেন বলিয়া একবার বিঘোষিত করেন, তাহাহইলে আযাযীলও বলিবে আমিও উহার ভাগ প্রাপ্ত হইব !

প্রভু স্বীয় দাসগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা ভংগ করা তাঁহার গৌরবের পক্ষে হানিকর কিন্তু অপরাধী দাসের জন্য যে শাস্তির বিধান তিনি নির্ধারিত করেন, যদি দয়া পরবশ হইয়া তিনি দাসের জন্য তাঁহার উক্ত দণ্ডাদেশকে রহিত করিয়া দেন তজ্জন্য তাঁহার গৌরব এবং ন্যায়-পরায়ণতা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়না। আল্লাহ'র সীমাহীন ও অনন্ত অনুকম্পা এবং ক্রোধ অপেক্ষা তাঁহার রহমতের আতিশয্যের যে সকল প্রমাণ আমি কোরআন ও ছুন্নাহ হইতে উধৃত করিয়াছিলাম, ডক্টর ছাহেব সেগুলিকে আমার 'কিয়াছ' বলিয়া উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, অথচ তিনি পুত্রের ধৃষ্টতা ও পাপের জন্য পিতামাতার ক্রোধ আর মানুষের দোষ ত্রুটির জন্য অপর মানুষের প্রতিশোধ স্পৃহার যেসকল ঔপমানিক প্রমাণ (Analogy) সমুপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলিকে কোরআনী দলীল মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহিয়াছেন। ডক্টর ছাহেব আমার মরহুম অগ্রজের সাহিত্যিক জীবনের সহযোগী না হইলে এবং তাঁহার বয়সের প্রতি আমার লক্ষ না থাকিলে আমি তাঁহাকে 'কিয়াছ' এবং উহার বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কে অবহিত হইবার পরামর্শ দিতাম।

এইরূপ 'আবাদান' শব্দের তাৎপর্য—'বহু দীর্ঘ-কাল স্থায়ী' হওয়ার আমি আভিধানিক ও সাহিত্যিক-গণের যেসকল অভিমত এবং এ সম্পর্কে কোরআনের প্রয়োগ উধৃত করিয়াছিলাম, সেগুলিকেও তিনি 'কিয়াছ' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু মযার কথা এইযে, নিজের অভিমতের পোষকতায় তিনি মুল্লা আলী কারী ও শাহ অনওয়ার কাশ্মীরীর যেসকল উক্তি উধৃত করিয়াছেন, সেগুলিকে 'কোরআন অনু-যায়ী' ব্যাখ্যা বলিয়া আখ্যাত করিয়া খুশী হইয়াছেন। অভিন্ন যাত্রার এরূপ ভিন্ন ফলের নযীর যে অত্যন্ত বিরল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোরআনের বহুস্থানে 'আবাদান' শব্দের এরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে, যাহার অর্থ কোনক্রমেই 'সীমাহীন ও অনন্তকাল' করা সম্ভবপর নয়। হযরত মুছা আল্লাহর নির্দেশক্রমে ইছরাঈলের বংশধরদিগকে যখন পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার আদেশ দিয়াছিলেন, তখন তাহারা বলিয়া- قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا — ছিল, হে মুছা—আমরা কিছুতেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিবনা 'আবাদান' —আলমায়েদা, ২৩ আয়ত।

এই আয়তে 'আবাদানে'র তাৎপর্য 'সীমাহীন ও অনন্তকাল' স্বীকার করা কি সম্ভবপর ?

ছুরত-আল ফত্হে মদীনার মুনাফিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الی اهلیهم ابدا — হইয়াছিল, পক্ষান্তরে তোমরা ধারণা করিয়া- ছিলে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং মুমিনগণ তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট 'আবাদান' প্রত্যাবর্তন করি-বেননা—১২ আয়ত।

ছুরত আত্-তওবার মুনাফিকদিগকে জানাইয়া দিবার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ করা হইয়াছিল যে, আপনি বলুন— فقل لن تخرجوا معی ابدا — তোমরা জিহাদের জন্য আমাদের সংগে 'আবাদান' বহির্গত হইতে পারিবেনা —৮৩ আয়ত।

এইরূপ ছুরত আল জুমুআয় ইয়াহুদীদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, ولا یتمنونه ابدا — তাহারা 'আবাদান' মৃত্যু কামনা করিবেনা—৭ আয়ত।

উল্লিখিত আয়ত সমূহে কথিত 'আবাদান' শব্দের সহিত সীমাহীন ও অবিনশ্বর অর্থের কোনরূপ সুসংগতি নাই। 'আবাদানে'র যে অর্থ ডক্টর ছাহেব গ্রহণ করিয়াছেন, উহাকে একমাত্র অর্থরূপে গ্রহণ করিলে বেহেশ্ত ও দুযখ ছাড়া নিদান পক্ষে পবিত্রভূমি ফেলেস্তিন, রছুলুল্লাহ (দঃ), তাঁহার যুগের মুমিন ও মুনাফিক দল এবং ইয়াহুদী সমাজের অবিনশ্বরত্ব মানিয়া লইতে হইবে।

* مالکم کیف تحکمون ? (অসমাপ্ত)

* আপনাদের একি অবস্থা ? এ কিরূপ বিচার পদ্ধতি ?

Contents

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

অনুবাদ—আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

[উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারত উপমহাদেশে ইছলামী রাজ্যশাসন বিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে হযরত ছৈয়েদ আহমদ ব্রেলভী শহীদ ও আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ ইছমাঈল দেহ্‌লভী শহীদের যুগল নেতৃত্বে এবং তাঁহাদের শাহাদতের পর তদীয় স্থলাভিষিক্তগণ কর্তৃক যে রক্তাক্ত জিহাদ পরিচালিত হইয়াছিল, বিপক্ষদলের ক্ষুরধার লেখনীর প্রভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উহা 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' নামে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই অগ্নি আন্দোলন শতাব্দীকাল ধরিয়া সমগ্র উত্তর ভারত এবং বাংলা ও আসামের মুছলমানগণের মধ্যে যে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যাহার ফলে ভারতের তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যেভাবে নাজেহাল হইতে হইয়াছিল, উক্ত কোম্পানীরই জনৈক বিশিষ্ট ও উচ্চকর্মচারী স্যর উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার 'Our Indian Musalman' অর্থাৎ 'আমাদের ভারতীয় মুছলিম প্রজা' নামক বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ সহকারে তাহার আংশিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই অমূল্য পুস্তকের অনুবাদ কার্য বহুপূর্বেই উর্দু ভাষায় সুসম্পাদিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদের বহু প্রতীক্ষিত কার্যে সম্প্রতি খুলনার মেছাঘোনা নিবাসী প্রবীণ সাংবাদিক এবং অধুনালুপ্ত 'নবযুগ' দৈনিকের সম্পাদক জনাব মওলানা আহমদ আলী ছাহেব মনোনিবেশ করিয়াছেন। বক্ষমান প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবাদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি কলিকাতার একটি মাসিকপত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশলাভ করিতেছে। অনুবাদক তর্জুমান সম্পাদককে যে ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি আশা করিয়াছেন যে, "আজ যাহারা ইছলাম ও ইছলামী শরীঅতের বিরুদ্ধাচরণে মাতিয়াছে, ইহাদের কুষ্টিনামা এই পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে"— তর্জুমান সম্পাদক—

উলেমাবৃন্দের ফতোয়া

বিদ্রোহী ওহাবী প্রচারকগণ বাংলায় তাঁহাদের স্বদেশবাসী প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ব্যতীত বিদ্রোহ তৎপরতা চালাইতে পারেনাই। মুসলমানদিগের মধ্যেও দ্বিমতের অবকাশ ছিল। খৃষ্টানগণ যেমন নানা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হওয়ার দরুণ তাহাদের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি মুসলমানদিগের মধ্যেও উহার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় এবং সেজন্য তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তীব্র কলহ বিবাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। একেই তো হিন্দু মুসলমান জমিদার ও পুঁজিপতি ব্যবসায়ী শ্রেণী সংস্কার পন্থী ওহাবী প্রচারকদের তাহাদের এলাকায় উপস্থিত হওয়াকে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে, তার উপর মুসলমান সমাজের একটি অংশের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ওহাবী বিদ্বেষ দানা বাঁধিয়া উঠায় এবং হিন্দুগণ সাধারণতঃ রাজভক্ত হওয়ায় বর্তমানে পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বত্র ওহাবী প্রচারকদিগের উপস্থিতি সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছেনা। ওহাবীগণ ধর্ম্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবপন্থী। পক্ষান্তরে তাহাদের কাজ মার্টিন লুথার এবং অলিভার ক্রমওয়েলের ন্যায় গঠনমূলক নহে বরং রোদাস ও ট্যানেহলিনের [Tanehlin] ন্যায় ধ্বংসমূলক এবং যেমন আট্রাষ্ট [Utrecht] এর পাদ্রী সমাজ ট্যানেহলীনের সংস্কারের নামে ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি যে মত গ্রহণ করিয়াছেন উহাই প্রকৃত খৃষ্টান ধর্ম্ম, তিনি সর্ব্বদা তিন সহস্র সশস্ত্র অনুচর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন এবং তাহারা তাঁহাকে খৃষ্টের ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। পাদ্রীর অঙ্গধৌত পানিকে তাহারা পবিত্র জ্ঞানে সেবন করিত। তেমনি যে সমস্ত মুসলমান মোল্লার একিয়ারে মসজিদ, খান্‌কা এবং সেই সংশ্লিষ্ট কয়েক একর করিয়া নিষ্কর জমি আছে, তাহারা ওহাবী সংস্কারের নামে ভীত ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। তথ্যাদি অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই জন্য বিগত ৫০ বৎসর কাল ধরিয়া ওহাবীদিগের নামে সর্ব্বত্র ত্রাস সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। ১৮১৩ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন ওহাবীর পক্ষে নিরাপদে মক্কা ভূমিতে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও জমিদার

ও ধর্ম্মীয় নেতাগণ একযোগে সর্ব্বপ্রকার বিপ্লব ও সংস্কারকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত। ইংরেজ জমিদারগণ যে ভাবে গীর্জ্জার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, মুসলমান জমিদারগণও ঠিক সেই ভাবে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাঁহাদের উভয়েই সমমনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে বিপ্লব সাধনের বিরোধিতা করিয়া থাকেন। ভারতের ওহাবীগণ ধর্ম্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর বিপ্লবপন্থী রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহাদিগকে এনাবিটিস এবং স্বদেশের মঙ্গল কামনায় যাহারা সন্ত্রাসবাদী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রাজনীতি ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থী ওহাবীগণ কঠোর ভাবে ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রপন্থী হওয়ায় তাহারা মুসলমান সামন্ত ও জমিদার এবং পুঁজিপতিদিগকে ক্ষণেকের তরেও বরদাশত করিতে প্রস্তুত নহে। এই জন্য এই দলের এমাম সৈয়দ আহমদ সাহেবকে ১৮২৮ সালে যুগপৎ ভাবে পেশোয়ারের প্রতিক্রিয়াপন্থী মুসলমান শাসনকর্ত্তা (ইয়ার মোহাম্মদ খানের) ও পাঞ্জাবের শিখ শক্তির বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযান চালাইতে দেখা গিয়াছে। ১৮৩১ সালে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, উহাও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে জমিদার মাত্রেরই বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া দিয়াছিল, বরং সত্য কথা এই যে, হিন্দুর তুলনায় মুসলমান জমিদারদিগকেই তাহাদের দ্বারা অধিক পরিমাণে নিপীড়ন ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহারা তাহাদের সংস্কার মোতাবেক স্বধর্ম্মী বেদয়াত পন্থীদিগের উদ্ধারার্থ তাহাদের যুবতী বিধবা কন্যাদিগকে জোরপূর্ব্বক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত বিবাহ দিত। সমাজের সাধারণ স্তরের লোক দ্বারা এই দল গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান জমিদারগণ আপনাদের কন্যাদিগকে এই দলের লোকের সহিত বিবাহ দেওয়াকে বংশ মর্য্যাদার পক্ষে হানিজনক বলিয়া মনে করিত। উহার পঞ্চদশ বৎসর পরের সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে যে, এই দলের লোক সংখ্যা আশি হাজার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, (বাংলার পুলিশ কমিশনার মিঃ ষ্টাম্পারের রিপোর্ট) এবং তাহাদের মধ্যে নির্ম্মল ভ্রাতৃত্বভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বলা-বাহুল্য তাহাদের শতকরা নিরানব্বই জনই সমাজের সাধারণ স্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই প্রকার সংস্কার পন্থী ধর্ম্মীয় লোকেরা কোন ক্রমেই আত্মস্বার্থ সর্ব্বস্ব আরাম প্রিয় পুঁজিপতিদের নিকট সহানুভূতির আশা করিতে না পারিলেও বাংলার এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ধনী ব্যবসায়ী মুসলমান কিন্তু পূর্ব্বাপর তাহাদিগকে সাহায্য যোগাইয়াছে। ইহারা হইতেছে চর্ম্ম ব্যবসায়ী। হিন্দুগণ গরুকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, এজন্য যাহারা মৃত গরুর দেহ হইতে চর্ম্মস্খালন করে তাহাদিগকে তাহারা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত। বিশেষতঃ চর্ম্মস্খালনকারী চামারগণ টাকার লোভে কেবল যে মৃত গরুর চর্ম্মস্খালন করিয়া থাকে তাহা নহে, অনেক সময় মৃত গরুর অভাবে তাহারা তীব্র বিষ ভক্ষণ করাইয়া জ্যান্ত গরু হত্যা করিয়াও থাকে। সুতরাং যে জীবকে হিন্দুগণ পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে সেই জীবের জীবন লইয়া যে সমস্ত নীচ লোক এই প্রকার নিকৃষ্ট আচরণের পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে এবং উহার ব্যবসায়ী মাত্রকেই হিন্দুগণ অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে গরু সম্বন্ধে এই প্রকার কোন কুসংস্কারের অস্তিত্ব মাত্রও বিদ্যমান নাই। এই জন্য বিপুল লাভজনক চর্ম্ম ব্যবসায়টী মুসলমানগণ এক চেটিয়া ভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে। এই চর্ম্ম ব্যবসায়ী মুছলমানগণ ধনৈশ্বর্য্যে ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ চর্ম্ম ব্যবসায়ী মুসলমানদিগের বিপুল ধন সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে এবং সে জন্য অন্যভাবে উহার উপযুক্ত মূল্যও তাহাদিগকে আদায় করিতে হইয়াছে। কারণ মুসলমান চর্ম্মব্যবসায়ীগণ একথা

নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে, ভারতে যদি সাময়িক ভাবেও কিছু দিনের জন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাহইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকেই তাহাদের অত্যাচারের সম্মুখীন হইয়া নিশ্চিহ্ন হইতে হইবে। সুতরাং ইংরেজ ও হিন্দু সর্ব্বশ্রেণীর কাফেরের বিরুদ্ধাচারী ওহাবীদিগের শক্তিবর্দ্ধনের জন্য তাহারা মুক্ত হস্তে অর্থ যোগাইয়াছে।

ইহা হইতেছে চর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগের পক্ষের কথা। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ওহাবীদিগের অবস্থা ভিন্ন রকমের। কারণ এই শ্রেণীর সংস্কারপন্থী ধর্ম্মীয় দল যেমন কোন প্রকার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে অভ্যস্ত নহে, তেমনি তাহারা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মুখাপেক্ষী হইতেও চাহেনা। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা দল তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতেছে কিনা, সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও ভ্রূক্ষেপহীন। এই জন্য ওহাবী প্রচারকগণ কোন বিশেষ ধনীশ্রেণীর মুখাপেক্ষীতাকে সম্বল না করিয়া আম জনতার সম্মুখে গিয়া তাহাদের আদর্শ প্রচার করিয়াছে। কারণ এই জনসাধারণকেই তাহারা তাহাদের শক্তির কেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই আম জনতাই যে ধর্ম্ম ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সংস্কার গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত পাত্র, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য, আর যে একটী দৃঢ় শক্তির ভিত্তির উপর ওহাবী বিপ্লবীগণ দাঁড়াইয়াছিল, সত্যের খাতিরে একান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাও আমাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। তাহাদের মধ্যে এরূপ বিশুদ্ধ জীবনের উন্নত ধরণের সহস্র সহস্র কর্ম্মী বিদ্যমান, যাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয়না। বলা বাহুল্য তাহারা মাত্র চরিত্র ও আদর্শ নিষ্ঠাতেই নহে, দৈনন্দিন ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকর্ম্ম পালন এবং সেবা ও ত্যাগের দ্বারাও তাহারা অন্যের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথমে তাহারা কঠোর ভাবে জীবনশুদ্ধির ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা এই প্রকার অপূর্ব্ব পবিত্র জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই শ্রেণীর পবিত্র স্বভাব লোকেরাই যে এই দলের শক্তির মূল উৎস, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বলা বাহুল্য এই জন্যই সর্বশ্রেণীর লোকেরা তাহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাঁহাকেই লোকে উৎকৃষ্ট ওহাবী বলিয়া মনে করিয়া থাকে, যিনি ন্যায়ের জন্য কাহারও ভয়ে ভীত নহেন এবং কাহারও অনুগ্রহেরও মুখাপেক্ষী নহেন। তাহারা এই প্রকার লোভহীন বিশুদ্ধ জীবন লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন বলিয়া কোন প্রকার ভয় ভীতি অথবা প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমানেও বাংলার কোন এক জেলখানায় এরূপ একজন পবিত্র স্বভাব শ্বেত শ্মশ্রু বিশিষ্ট বর্ষীয়ান পুরুষ বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন যাঁহার কথা স্মরণে আসিবা মাত্র আমার অন্তরে ভক্তির ভাব উদ্রিক্ত না হইয়া পারেনা। কিন্তু তাঁহার জীবন সর্বপ্রকার কলুষ মুক্ত হইলেও তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহী এবং সেই বিদ্রোহ তৎপরতার পথে কোন প্রকার বাধা বিঘ্নকেই তিনি আমল দিতে চাহেননাই। গবর্ণমেণ্ট তিরিশ—বৎসর কাল তাঁহার বিদ্রোহাত্মক কর্ম্মপ্রণালীর খবর রাখিয়া আসিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহার আচরণ জানিতেছেন তাহা তিনিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, কিন্তু তিনি নিরস্ত হন নাই। ১৮৪৯ সালে তাঁহাকে একবার নিয়মিত ভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ১৮৫৩ ও ১৮৫৭ সালে দুইবার তাঁহাকে দৃঢ়তা সহকারে সতর্ক করা হয়। কিন্তু কোন সাবধান বাক্যই কার্য্যকরী না হওয়ায় অবশেষে ১৮৬৪ সালে তাঁহাকে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ভালরূপে সাবধান করিয়া দিয়া ধারণা করা গিয়াছিল যে, অতঃপর তিনি নিরস্ত হইবেনই। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়া যাওয়ায় ১৮৬৯ সালে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। এই শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ পবিত্র স্বভাব লোকদিগকে কোন প্রকার দণ্ড দিবার বেলায় গবর্ণমেণ্টকে একান্ত ভাবে মুশকিলের সম্মুখীন হইতে হইয়া থাকে। কারণ এই শ্রেণীর সাধু স্বভাব লোকেরা কোন প্রকার অভিসন্ধি দ্বারা

চালিত নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরের সরল বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া যে নীতি ও কার্য্যকে করণীয় বলিয়া মনে করেন, মনের সরল আবেগের সহিত সেই কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সে জন্য সর্বপ্রকার ভয় ভীতি এবং নির্য্যাতনকে তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে এই শ্রেণীর লোককে পীড়নের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট বন্দী করেননা; প্রথমতঃ তাঁহাদের অনিষ্টকর প্রচারণার হাত এড়াইবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের বন্দী জীবন অন্যের পক্ষে শিক্ষনীয় হইতে পারে মনে করিয়াই এই শ্রেণীর লোককে নজর বন্দী করা হইয়া থাকে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন লোকের পক্ষে ওহাবী মতাবলম্বী হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী জীবনশুদ্ধি এবং সামাজিক সাম্যের ভিত্তির উপর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। তারপর যিনি পীরের (নেতার) নিকট মুরিদ হইবেন, মুরিদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের আয়ের একটী প্রধান অংশ জেহাদ ফাণ্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। অর্থদানের উপরে রহিয়াছে জেহাদের জন্য জীবনদানের প্রশ্ন। বিগত-কালের রাজনৈতিক মোকদ্দমা সমূহে যে সমস্ত রংরুট সাক্ষ্যদান করিয়াছে, উহাপেক্ষা বেদনাকর কথা আমার চিন্তায় স্থান পায় না। ওহাবী প্রচারকগণ পূর্ববাংলার প্রায় প্রতি জেলার পল্লী অঞ্চলে প্রচার চালাইয়া শত সহস্র কৃষক যুবকদিগকে গৃহছাড়া করিয়া সীমান্তের মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রেরণ করিয়াছে এবং সেখানে পৌঁছার পর তাহাদের অধিকাংশকেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। পল্লী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই সকল যুবকের বয়স বিশ বৎসরের অধিক হইবেনা। এজন্য বাংলার পল্লী অঞ্চলস্থিত সহস্র সহস্র মুসলমান কৃষকের গৃহে শোকের কৃষ্ণছায়া নামিয়া আসিয়াছে। মোট কথা, ওহাবী প্রচারকবৃন্দ জেহাদী প্রচারণার দ্বারা বাংলার মুসলমান যুবক-দিগের অন্তরে যেরূপ উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে বাংলার ধর্মভীরু মুসলমানগণের মধ্যে কেহ তাহার স্বাস্থ্যবান, ধর্মভীরু, সরলচিত্ত ও কর্মঠ যুবক পুত্র কতক্ষণ গৃহে থাকিয়া সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, সে বিষয়ে কোন নিশ্চিত ভরসা পোষণ করিতে পারিতেছেনা। এইভাবে যে সমস্ত যুবক গৃহত্যাগ করিয়া থাকে তাহাদিগকে সুদীর্ঘ পথের পথকষ্ট, অনাহার রোগ ও ব্যাধিদ্বারা তো নির্য্যাতিত হইতে হয়ই অধিকন্তু অবশেষে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া অধিকাংশকে প্রাণাহুতি দিতে হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর রংরুটদিগের মধ্যে যাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়, তাহারা আসিয়া যে প্রকার বর্ণনা উপস্থিত করিয়া থাকে নমুনাস্বরূপ একটি যুবকের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমি পাটনার খলিফা সাহেবের মুরিদ। আমার বয়স যখন দশ বারো বৎসর, সেই সময় আমি আমার গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত রামপুর বোয়ালিয়া গ্রামে গিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা আরম্ভ করি। আমার ওস্তাদ জেহাদের নক্সা প্রস্তুত করিতেন এবং জেহাদের জন্য লোক ও অর্থ প্রেরণের চিন্তায় মশগুল থাকি-তেন। আমার বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর সেই সময় তিনি আমাকেও জেহাদে যোগদানের জন্য আমার বাড়ী হইতে প্রায় দুই হাজার মাইল দূরে ছাতিয়ানা ক্যাম্পে আমাকে প্রেরণ করিলেন। পটনা ও দিল্লী হইয়া আমি গমন করি। পাটনায় মাত্র আমি এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়া সঙ্গীদের সহিত দিল্লী গমন করি। দিল্লী হইতে আমার সঙ্গীগণ ছাতি-য়ানা গমন করিল। আমি আরও শিক্ষালাভের জন্য দিল্লীতে জনৈক আলেমের নিকট থাকিয়া গেলাম। উহার দেড় বৎসর পরে যখন একটী মুজাহিদ দল সীমান্ত অভিমুখে গমন করিতেছিল। আমি তাহা-দের সহগামী হইয়া গুজরাট পর্য্যন্ত গিয়া আমি সেখানে রহিয়া গেলাম, সঙ্গীরা চলিয়া গেল। কিছু দিন পর আবার একটী অভিযাত্রী দল পাইয়া তাহাদের সঙ্গে গিয়া পার্বত্য অঞ্চলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে পৌছার পর আমাদিগকে নিশ্চিত রূপে বলা হইল যে, এমাম সৈয়দ আহমদ সাহেবের

(৩৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

(৮)

(৬) এই হাদীছের যে অংশটিকে গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণ বেমালুম হযম করিয়া তাঁহাদের সততার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং অজ্ঞ জন-সমাজের নিকট হইতে বাহবা-প্রাপ্ত হন, তাহার স্বরূপ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তিরমিযী কর্তৃক রেওয়ায়তের মতনটি আর একবার পাঠকবৃন্দের মনোযোগ সহকারে পড়িয়া যাওয়া উচিত। এই হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, দাসীটিকে তাহার কার্যে বাধা প্রদান না করিলেও তাহার আচরণে রছুলুল্লাহ (দঃ) আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেননা এবং তাহার এই কার্যকে তিনি শয়তানী কার্যের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং হযরত উমরের আগমনে যখন উল্লিখিত ক্রীতদাসী দুফ বাজাইবার কার্য হইতে নিরস্ত হয়, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কারণেই ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে' গ্রন্থে এবং শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ তাঁহার 'ইযালাতুল খফা' নামক পুস্তকে এই হাদীছটিকে মনাকিব বা প্রশংসার অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

হাদীছে কথিত হইয়াছে যে, ক্রীতদাসী দুফ্‌ বাজাইতে আরম্ভ করিল, ইতিমধ্যে আবুবকর গৃহে প্রবেশ করিলেন কিন্তু নারীটি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাজাইতেই থাকিল, অতঃপর আলী মুর্তযা আগমন করিলেন তথাপি সে ক্ষান্ত হইলনা, হযরত উছমান যখন ইহার পর আগমন করিলেন তখনও সে বাজাইতেই থাকিল কিন্তু যেমনই হযরত উমর প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দর্শন করা মাত্র ক্রীতদাসী তাহার দুফ্‌ ফেলিয়া দিয়া তদুপরি বসিয়া পড়িল। রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত উমরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে উমর, তোমাকে দর্শন করিলে শয়তানও ভয় পায়! দেখ, এই নারীটি আমার সম্মুখে আর আবুবকর, আলী ও উছমানের সম্মুখে দুফ্‌ বাজাইবার কার্য হইতে নিরস্ত হইলনা, কিন্তু যেমনই তুমি গৃহে প্রবেশ করিলে অমনি সে দুফ্‌ ফেলিয়া দিয়াছে"। *

ইমাম আহ্‌মদের রেওয়ায়তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে উমর, শয়তান তোমার নিকট হইতে পলায়ন করে। আমি এস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছি আর ইহারা সকলে অর্থাৎ আবুবকর,

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الشيطان ليفرق منك ياعمر، انا حالس ههنا ودخل هؤلاء،

(৩৫৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। সেই স্থানে আমি আট, নয় হাজার মুজাহিদকে সশস্ত্র অবস্থায় সংঘবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি দশ বারো বৎসর বয়সে যে উস্তাদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছি, তিনিই মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব করিতেছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে পাটনার খলিফা পদে অভিষিক্ত রহিয়াছেন। কিছু দিন অবস্থান করিয়া যখন বুঝিলাম যে, এমাম সাহেবের পুনরাবির্ভাবের কথা ধোকাবাজী ছাড়া কিছুই নহে, তখন আমি ও আরও কতিপয় ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীতে চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পরে এখানে জনৈক আরব উপস্থিত হইয়া আমাকে দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন যে, প্রকৃতই এমাম সৈয়দ আহমদ ছাতিয়ানায় (স্থানা?) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার এই কথায় আস্থা স্থাপন পূর্বক জেহাদে যোগদানের সংকল্প করিয়া আমি পুনরায় ছাতিয়ানায় গমন করিলাম। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া খোঁজ খবর লইয়া যাহা বুঝিলাম তাহা হইতেছে এই যে, আমাকে দ্বিতীয় বারও প্রথম বারের ন্যায় প্রতারিত হইতে হইয়াছে। অতঃপর বৃটিশ বাহিনী মুজাহিদ ক্যাম্পের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার আয়োজন করিতেছে শুনিয়া আমি পলায়ন পূর্বক দিল্লীতে চলিয়া আসিলাম এবং সেখান হইতে আমার গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া আসিয়াছি।" (ক্রমশঃ)

* তিরমিযী, মর্মানুবাদ (৪) ৩১৬ পৃঃ।

আলী ও উছমান এই স্থানে প্রবেশ করিয়া- فلما دخلت انت فعلت ما فعلت ـ

ছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই নিরস্ত হয় নাই অথচ যেমনই তুমি আগমন করিলে স্ত্রীলোকটি যাহা করিল, তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ। †

ফলকথা, কৃষ্ণাংগী ক্রীতদাসীর দুফ্ বাজাইবার ঘটনাটিকে সংগীত চর্চার ব্যাপক বৈধতার প্রমাণ রূপে উপস্থিত করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈধ আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে নারীদের জন্য চালুন, থালা অথবা দুফ বাজান নিষিদ্ধ নয়, এই আদেশ শুধু নারীদের জন্যই সীমাবদ্ধ এবং কেবল বৈধ উৎসবেই এই কার্যের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) কোনক্রমেই কৃষ্ণাংগীর এই কার্যে সন্তুষ্ট ছিলেননা কিন্তু যেহেতু নারীদের জন্য যেকার্য অবৈধ নয় স্ত্রীলোকটি তাহারই নযর মান্য করিয়াছিল আর পাপাচরণ না হওয়া পর্যন্ত নিরর্থক কার্যের নযরও প্রতিপালন করা দোষাবহ নয় বলিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) ক্রীতদাসীর মনস্তুষ্টি সাধনকল্পে উহাকে দুফ বাজাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন, গান করার অনুমতি দেন নাই এবং স্ত্রীলোকটির গান করার হাদীছ প্রমাণিত নয়! পক্ষান্তরে হযরত উমরের আগমন দ্বারা এই কার্যটি রহিত হওয়ায় রছুলুল্লাহ (দঃ) সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং হযরত উমরের তিনি যে ভাষায় প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে দাসীর উক্ত কার্যটি প্রশংসনীয় না হওয়ার সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে।

পঞ্চম হাদীছ

রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণ ও উহার আদেশ প্রদান করার প্রমাণ রূপে সংগীত চর্চার মুফতীগণ এই মর্মের একটি হাদীছও উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, হযরতের (দঃ) একজন 'হুদী' গায়ক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল— আন্‌জাশা।

আমাদের বক্তব্য

রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণ করা অথবা তাহার জন্য অনুমতি দেওয়া এমন কি ব্যাপক ভাবে সংগীত চর্চা জায়েয হইবার পক্ষে এই হাদীছটি কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। কারণ.—

† মুছনদ (৫) ৩৫৩ পৃঃ; ইযালাতুল খফা ৯১ পৃঃ।

(ক) গীতবাদ্য ও হুদীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে।

ডক্টর লেন তাঁহার আরাবী-ইংলিশ শব্দকোষে লিখিয়াছেন,

حداء, The Arabs in driving their Camels used commonly to sing verses of the kind termed رجز Originated from the fact of a Desert Arab's beating his young man, or boy & biting his fingers; where upon he went along saying يدى يدى. Oh my two hands! and the camels went on at his cry. Therefore his master bade him keep to it.

অর্থাৎ জনৈক মরুবাসী আরব তাহার বালক ক্রীতদাসকে প্রহার করিতেছিল এবং তাহার আঙুল কামড়াইয়া দিয়াছিল, ইহাতে বালকটি 'দাইয়ুন' 'দাইয়ুন' অর্থাৎ আমার হাত গেল! হাত গেল! বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে তাহার এই চীৎকার ধ্বনির তালে তালে উটগুলি চলিতে থাকে। উষ্ট্রের মালিক তাহার বালক ক্রীতদাসকে ঐভাবে চীৎকার করিতে থাকার জন্য বাধ্য করে। ইহাই হইতেছে 'হুদা' নামক সংগীতের উদ্ভব কাহিনী! § ডক্টর লেন তাজুল-অরূছের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, আরবরা তাহাদের উষ্ট্র-চালনার সময় সাধারণতঃ যে 'রাজায' শ্রেণীর সংগীত গাহিয়া থাকে তাহাকে 'হুদা' বলা হয়। ¶

এক্ষণে 'রাজাযে'র সংগীত শ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ছিহাহ, কামুছ ও আছাছের বরাতে তাজুলঅরূছে লিখিত হইয়াছে—

It is a name of a certain species of verse or poetry.

অর্থাৎ কবিতা অথবা পদ্যের একটি বিশেষ শ্রেণীকে 'রাজায' বলা হয়। আখ্‌ফাশ বলিয়াছেন, ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে 'রাজায' বলা হয়। Some say that it is not verse or poetry, but a

§ ফিরোযাবাদীর কামুছ (৪) ৩৩০ পৃঃ।

¶ Lexicon ৫৩৩ পৃঃ।

kind of rhyming prose. অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন,—'রাজায' কবিতা বা পদ্য নয়, উহা কাব্য ছন্দের গদ্য মাত্র। * ফিরোযাবাদীর কামুছ ও আয্হারীর তাহযীবে লিখিত হইয়াছে, আয়েনের গ্রন্থকার খলীলের অভিমত এই যে, উহা কবিতা নয়, উহা অর্ধ অথবা তৃতীয়াংশ কবিতা। §

ছুরাহ নামক ফার্ছী অভিধানে 'হুদা'র তাপর্যে লিখিত হইয়াছে,

راندن شتر بسرود و آواز

সুর ও শব্দ দ্বারা উষ্ট্র পরিচালিত করা। গদ্যের মধ্যেও যে সুর ও আওয়াযের স্থান রহিয়াছে, কোরআনের প্রত্যেক ক্বারীর তাহা অবিদিত নাই কিন্তু তাই বলিয়া কোরআনকে গানের পুস্তক মনে করা মূর্খতার পরিচায়ক।

(খ) হুদীকে বিশেষ শ্রেণীর সংগীত, বলিয়া ধরিয়া লইলেও উহা কি ধরণের সংগীত পাঠকবর্গ তাহার নমুনা গ্রহণ করুন :

بشرها دليلها و قالا :
تزين الطلح والجبالا !

"উষ্ট্রকে তাহার পথপ্রদর্শক সুসংবাদ প্রদান করিল যে, তুমি মরুভূমি ও পর্বতের সৌন্দর্য!"

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে যে ধরণের হুদী আবৃত্তি করা হইত, এইবারে তাহার স্বরূপ অবগত হইয়া প্রিয় পাঠক পাঠিকা ধন্য হউন,

ইমাম আহমদ হাম্মাদের প্রমুখাৎ এবং তিনি ইয়াযীদের বাচনিক ছলমার উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন

عن سلمة قال : كان عامر
رجـــلا شاعـرا فـنـــزل
يحد ويقول : اللهم لولاما
اهتدينا' ولا تصدقنا ولا
صلينا ـ والقـين سكينـــة
علينا' وثبت الاقدام ان
لا قينا ! فقال رسول الله
صلے الله عليه وسلم : من
هذا الحادى ؟ قالـوا :
ابن الاكوع ! قال :
يرحمه الله !

যে, আমির বিন্নুল আকওয়া একজন কবি মানুষ ছিলেন, একদা কোন এক অভিযানের পথে তিনি উষ্ট্র পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া হুদী আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হে আমাদের প্রভু, যদি আপনি আমাদিগকে সঠিক পথের সন্ধান না দিতেন, তাহা হইলে আমরা সৎপথে দান এবং আপনার উপাসনা করিতামনা। অতএব হে প্রভু, আপনি আমাদের উপর আপনার শান্তি অবতীর্ণ করুন আর আমরা শত্রু-সম্মুখীন হইলে আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই 'হুদা' গায়ক? লোকেরা জওয়াব দিলেন, আমির বিন্নুল আকওয়া, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন। †

এই শ্রেণীর 'হুদীকে'ই বিশুদ্ধ আলিমগণ জায়েয বলিয়াছেন। শয়খুল ইছলাম ইব্নে-তয়মিয়ারও ইহাই ফতওয়া। §

কিন্তু বাদ্যযন্ত্র-বিহীন এই সরল আরাবী ত্রিপদী ছন্দের কবিতা সুর করিয়া আবৃত্তি করা জায়েয হইলেই কি বাদ্যযন্ত্র-সমন্বিত ব্যাপক সংগীত চর্চার বৈধতা প্রমাণিত হইয়া যাইবে?

রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণ করা এবং উহার অনুমতি ও আদেশ দেওয়া সম্বন্ধে সংগীত চর্চার মুফতীগণ সচরাচর যে সকল হাদীছের অবতারণা করিয়া থাকেন, সেগুলির বিচার ও আলোচনা এই স্থানে শেষ হইল। কিন্তু এই প্রসংগ সমাপ্ত করার পূর্বে আর একটি কথা বিশদ রূপে জানিয়া রাখা উচিত যে, মদ্যপানের নিষিদ্ধতা, সুদের হুরমত এবং হিজাবের নির্দেশ প্রভৃতি ইছলামী বিধিনিষেধগুলি ক্রামশিক ভাবে ইছলামী বিধানের পূর্ণতালাভের সংগে সংগে রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোকপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী বৎসর গুলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অতএব ইছলামী বিধিনিষেধের পূর্ণতা প্রাপ্তির—অন্তর্বর্তীকালীন কোন ঘটনাকে শরয়ী দলীলের চূড়ান্ত মীমাংসা রূপে সমুপস্থিত করা রীতি-বিগর্হিত ও অন্যায়। এই ধরণের কোন ঘটনার বিচার ও আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়ার কার্যকে আমরা মূল্যবান সময়ের অপচয় বলিয়া বিশ্বাস করি।

* Lexicon ১০৩৭ পৃঃ। § কামূছ (২) ১১৬ পৃঃ।

† মুছনদে আহমদ (৪) ৪৭ পৃঃ।
§ মজ্মুআতুররাছায়েল ২৯৯ পৃঃ।

* * *

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে যে ভাবের সংগীত, যতটুকু, যে আকারে এবং যাহাদের জন্য জায়েয রাখা হইয়াছিল, আজ সেই প্রকারের ততটুকু সংগীত তাহাদের জন্য আবৃত্তি করার কার্যকে পৃথিবীর কোন আলেমই নিষেধ করেননা। মাদ্‌রাছা ও মক্তব সমূহে আবহমান কাল হইতে কাব্য গ্রন্থের পঠন ও পাঠন প্রচলিত রহিয়াছে, বাঙলার অতীত যুগের ধর্ম প্রচারকগণ যতগুলি বহি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশই পদ্য ছন্দে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আলিম সমাজ যে ধরণের সংগীত চর্চায় আপত্তি জানাইয়া থাকেন তাহা সুধী সমাজের অপরিজ্ঞাত নয়। অথচ আলিম সমাজ কর্তৃক নিষিদ্ধ গীত বাদ্যের বৈধতা সাব্যস্ত করার জন্যই সংগীত চর্চাকারী দলের মুফ্‌তীগণ দলীল পত্রের অবতারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ যাবত তাঁহাদের উপস্থাপিত প্রমাণ সমূহের মধ্যে এমন একটি দলীলও তাঁহারা সমুপস্থিত করিতে সমর্থ হন নাই, যাহার সাহায্যে আলিম সমাজের অনভিপ্রেত ও আপত্তিকর গীত-বাদ্যের বৈধতা সাব্যস্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে যে সমাজের প্রশংসাভাজন হইবার জন্য গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণ উলামায়ে দ্বীনের পরহেযগারীর অতি-আগ্রহকে কটাক্ষ করিয়াছেন, সে সমাজের বাহবা লাভের জন্য এত আয়াস স্বীকার করার কোনই প্রয়োজন ছিলনা!

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت'
سردوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی !

(৫)

গীতবাদ্যের সমর্থকদল তাঁহাদের উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য আরো কতকগুলি দাবী সমুপস্থিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই দাবীগুলি আমি অতঃপর সংকলিত করিব!

(ক) তাঁহারা নছয়ীর ছুননের বরাত দিয়া বলিয়া থাকেন যে, দুইজন ছাহাবী সংগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন!

(খ) ইমাম নববী বলিয়াছেন, ছাহাবীগণ সংগীতচর্চার অনুমতি প্রদান করিতেন।

(গ) আবু তালিব মক্কী তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ছাহাবাগণ সাধারণ ভাবে সকল প্রকার সংগীত শ্রবণ করা জায়েয মনে করিতেন।

(ঘ) আবুল ফর্জ ইছফিহানী তাঁহার আগানী নামক গ্রন্থে বহু ছাহাবী ও তাবেয়ীর সংগীত চর্চা করার ও সংগীতকে উৎসাহ দানের কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

গীতবাদ্যের মুফতীগণ বলিয়া থাকেন, আগানীর পুস্তকখানা এরূপ প্রামাণ্য যে, হাফিয ইবনে হজর উহার উদ্ধৃতি ফত্‌হুলবারী গ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপ সমুপস্থিত করিয়াছেন।

(ঙ) উক্ত আগানী গ্রন্থে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সংগীতের প্রতি আসক্তি ও সংগীত চর্চার কথা আছে: ১। আবদুল্লাহ বিনে জা'ফর। ২। আবদুল্লাহ বিনে যুবয়র। ৩। নু'মান বিনুল বশীর। ৪। খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীয। ৫। আমীর মুআবিয়া। ৬। ছুকায়না বিন্‌তে হুছায়েন। ৭। আয়েশা বিন্‌তে তল্‌হা।

(চ) ইকদুলফরীদ গ্রন্থে বরা'বিনে মালিক নামক ছাহাবীর গান গাওয়া ও দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের নাবেগার নিকট গান শুনিতে চাওয়া এবং হযরত উমরের নাবেগার গান শ্রবণ করার কথা রহিয়াছে!

(ছ) ইমাম ইবনে হযম ও ইমাম মাওয়ার্দী তাঁহার 'আলহাভী' নামক পুস্তকে বহু ছাহাবা ও তাবেয়ীর সংগীত-চর্চার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণের উপরিউক্ত দাবী সমূহের প্রত্যেকটি অতঃপর আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সচেষ্ট হইব।

والله ولی التوفیق وبیده ازمة التحقیق -

(ক) আবু মছ্‌উদ ও ইবনে কঅব নামক ছাহাবীদ্বয়ের জারীয়াগণের সংগীত শ্রবণ করার কথা নছয়ীর ছুননে সত্যই মওজুদ রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত হাদীছে একথাও উল্লিখিত আছে যে, উহা বিবাহের মজলিছ ছিল। হাদীছের মতনে সুস্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে. আমির বিনে ছঅদ বলিতেছেন, আমি কুরযা বিনে কঅব ও আবু মছউদ আনছারীর

عن عامر بن سعد قال
دخلت علی قرظة ابن کعب
وابی مسعود الانصاری
فی عرس' واذا جواری
یغنین -

নিকট এক বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেস্থানে বালিকারা গান করিতেছিল। বিবাহ সভার কথা সংগীত

জায়েষকারীগণ কি উদ্দেশ্যে যে হযম করিয়া থাকেন, তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়, কারণ আমর বিনে ছঅদ ছাহাবীদ্বয়ের আচরণে যখন বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এই কথা বলিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অপনোদন করিয়াছিলেন যে, قد رخص لنا فى اللهو عند العرس - রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু বিবাহ উপলক্ষেই আমাদের অর্থাৎ আনছারীগণের জন্য সংগীতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। †

এই হাদীছের সাহায্যে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ মজলিছে বালিকাদের সংগীত গাওয়া এবং পুরুষদের পক্ষে উহা শ্রবণ করার অনুমতি রহিয়াছে। হযরত আয়েশার হাদীছ প্রসংগে ইতিপূর্বেই ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে গীতবাদ্যের বৈধতাকে নরনারী নির্বিশেষে সকল সময়ের জন্য মুক্ত ও অবারিত রাখিতে হইলে উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হাদীছের টুকরাটিকে হযম না করিয়া উপায় কি? এই জারীয়াদের সংগীতের অর্থ খেমটা, সিনেমা, যাত্রা ও দেহজীবিনীদের বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত বেহায়া সংগীত নয়। বুখারীর হাদীছের আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে, জারীয়াগণ সরল আরাবী কবিতা সুর করিয়া আবৃত্তি করিত মাত্র।

গীতবাদ্যের মুফ্‌তীরা সকল ক্ষেত্রে জারীয়া শব্দটির এরূপ ব্যাখ্যা করিতে অভ্যস্ত যে, অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের পক্ষে ধাঁধায় পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে অভিধান গ্রন্থে এই শব্দের যে তাৎপর্য উল্লিখিত আছে, তাহা মুছলিম নারীগণের বিভ্রান্তকারী গীতবাদ্যের মুফ্‌তী দলের উদ্দেশ্যের কোন দিক দিয়াই সহায়ক নয়। আল্লামা তাহির পট্টনী তাঁহার 'মজ্‌মউল বিহার' নামক হাদীছ-অভিধানে লিখিয়াছেন যে, যে নারী বয়ঃপ্রাপ্তা হয়নাই (অর্থাৎ স্বপ্নে যৌন সম্ভোগ করে নাই) তাহাকে الجارية من النساء من لم تبلغ الحلم - জারীয়া বলা হয়। ‡

ডক্টর লেন তাঁহার লেক্সিকনে জারীয়ার অর্থ লিখিয়াছেন, জাহায, সূর্য, নক্ষত্র ও বায়ু প্রভৃতি। অতঃপর ছিহাহ, মিছ্‌বাহ ও কামুছের বরাতে লিখিয়াছেন, A girl, young woman অর্থাৎ বালিকা, ছোট মেয়ে; A female of which male is termed غلام অর্থাৎ পুংলিঙ্গে গোলাম বা বালক যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার স্ত্রীলিঙ্গ। So called of her activity and runniq—বালিকাদের ক্ষিপ্রগতি, চপলতা ও দৌড়াদৌড়ির স্বভাবের জন্য তাহাদিগকে জারীয়া এবং বহু বচনে জওয়ারী বলা হয়। ক্রীতদাসী অর্থেও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে কিন্তু জারীয়া শব্দের বহুবিধ অর্থের মধ্যে কোন স্থানেই উহার অর্থ গায়িকা বা গায়িকা দাসী উল্লিখিত হয় নাই। ¶

অতএব জানা যাইতেছে যে, ইবনে কছির ও আবু মছ্‌উদ ছাহাবীদ্বয় গায়িকা দাসীর সংগীত শ্রবণ করেন নাই। সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের অল্প বয়স্কা বালিকারা সুর করিয়া যে সরল আরাবী কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, তাঁহারা কেবল তাহাই শ্রবণ করিয়াছিলেন। গীতবাদ্যের বৈধতার জন্য এরূপ নজীর উপস্থিত করা বিদ্বানগণের পক্ষে লজ্জাকর হওয়া উচিত।

(খ) ইমাম নববীর সাক্ষ্য দ্বারা শুধু সুর করিয়া আরাবী কবিতা আবৃত্তি করা এবং উহা শ্রবণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় মাত্র। ব্যাপক ভাবে ছাহাবাগণের সংগীত চর্চার অনুমতি প্রদান করার কথা ইমাম নববীর উক্তিতে নাই, এমন কি বাদ্য-যন্ত্রেরও তিনি কোন উল্লেখ করেননাই। অতএব সর্বশ্রেণীর সর্বকালীন সংগীত চর্চার বৈধতাকে এই উক্তির সাহায্যে প্রমাণিত করার চেষ্টা বিদ্বানগণের পক্ষে শোভনীয় নয়।

(গ) আবু তালিব মক্কী তাঁহার কুতুল কুলুব নামক গ্রন্থে ছাহাবাগণের সর্বপ্রকার সংগীত জায়েয রাখার যে কথা বলিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য নয়। ফিক্‌হী মছআলার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ পুস্তক ও গ্রন্থকারের নাম উচ্চারণ করা বাস্তবিকই অতিশয় বিস্ময়কর! বর্তমান যুগে একশ্রেণীর

† ছুননে নছয়ী ৫২৯ পৃঃ।

‡ মজ্‌মউল বিহার (১) ১৯১ পৃঃ নলকিশোর।

¶ Lane's Lexicon ৪১৬ পৃঃ।

শিক্ষাভিমানীরা কথায় কথায় বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থের হাদীছ গুলির বিদ্রূপ করিয়া থাকেন এবং এই সকল গ্রন্থে যে সমুদয় হাদীছ সন্নিবেশিত রহিয়াছে সেগুলির লম্বা চওড়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের প্রতিভা ও গবেষণা-শক্তির অপূর্ব পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু এই শ্রেণীর তথাকথিত মুক্ত-বুদ্ধির দল যখন 'কূতুল কুলূব' প্রভৃতি বিদ্বানগণের প্রত্যাখ্যাত পুস্তক সমূহের উদ্ধৃতি উপস্থিত করিয়া স্বীয় মতলব সিদ্ধ করিতে চান, তখন বাস্তবিকই হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়।

ঐতিহাসিক ইব্‌নেখল্লকান আবু তালিব মক্কী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি বাগ্দাদে আসিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাঁহার ভাষণে তিনি গোল-মাল করিয়া ফেলিলেন, বিদ্বানগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। মোহাম্মদ বিনে তাহির মকদছী বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ আবু তালিবকে বিদ-আতী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার সংস্রব বর্জন করিলেন, তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ¶

قدم ابو طالب بغداد' فوعظ الناس فخلط فى كلامه' فتركوه وهجروه - قال محمد بن طاهر المقدسى : بدعه الناس وهجروه و امتنع من الكلام -

ইমাম ইব্‌নেজওযী বলেন, আবু তালিব মক্কী ছুফীদের জন্য কূতুল-কুলূব রচনা করেন এবং তাহার মধ্যে বাতিল হাদীছ সমূহ এবং ভিত্তিহীন— প্রক্ষিপ্ত উক্তি সন্নি-বেশিত করেন। খতীব-বাগ্দাদী সাক্ষ্য দিয়া-ছেন, আবু তালিব মক্কী ছুফীদের ভাষায় কূতুল কুলূব পুস্তক রচনা করেন এবং তাহাতে নানা-রূপ নিন্দনীয় উক্তির অবতারণা করেন। ‡ শয়খুল-ইছলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়া বলেন, কূতুল কুলূব পুস্তকে বহু দুর্বল ও মওযু হাদীছ রহিয়াছে এবং অনেক প্রত্যাখ্যাত কথার উহাতে অবতারণা করা হইয়াছে। ¶

صنف للصوفياء ابو طالب المكى قوت القلوب' فذكر فيه الاحاديث الباطلة وما لايستند فيه الى اصل و غير ذلك من الموضوع - قال الخطيب البغدادى : صنف ابو طالب المكى كتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه اشياء منكرة -

ان فى قوت القلوب احاديث ضعيفة وموضوعة واشياء مردودة كثيرة -

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলেন, হাদীছ শাস্ত্রে আবুতালিব মক্কীর অবহেলার পরিমাণ প্রচুর। ‡

شيخ ابوطالب در علم حديث تسا هلات بسيار دارد -

ফলকথা—আবু তালিব মক্কী একজন উচ্চশ্রেণীর ছুফী ছিলেন। ইবনে খল্লকানের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি বহু দিন উপর্যুপরি অনাহারে থাকিয়া ও পত্র-পল্লব চিবাইয়া সাধন ভজন করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধনা ও ইবাদতের আগ্রহাতিশয্যের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা সম্ভবপর, কিন্তু তাঁহার রেওয়ায়ত সম্পর্কে হাদীছতত্ত্ব বিশারদগণ যেসকল আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহার বর্ণনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সত্যান্বেষীগণের পক্ষে সমীচীন হইতে পারেনা। পক্ষান্তরে সংগীত চর্চা সম্পর্কে তাঁহার যে ফতওয়া শয়খ শিহাবুদ্দীন— ছুহ্‌রাওয়ার্দী তাঁহার ভুবন বিখ্যাত 'আওয়ারিফুল ম'আরিফ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, আবু তালিব মক্কী সর্বপ্রকার সংগী-তের বৈধতাকে স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

و فى السماع حرام وحلال وشبهة' فمن سمعه بنفس مشاهدة شهوة وهوى' فهو حرام' و من سمعه بمعقوله على صفة مباح من جارية او زوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه' و من سمعه بقلب شاهد معانى تدله على الدليل و يشهده طرقات الجليل فهو مباح -

অর্থাৎ সংগীত শ্রবণ করা ত্রিবিধ যথা, হারাম, হালাল ও সন্দেহমূলক। স্বীয় প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ

¶ তারীখ ইব্‌নে খল্লকান (১) ৪৯১ পৃঃ।
‡ নক্‌দুল ইল্‌ম ২৫৩ পৃঃ।

¶ ফতাওয়া (২) ১৯৪ পৃঃ।
‡ কুর্‌রাতুল আইনাইন ৩০৪ পৃঃ।

মহাপ্রলয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

(সংকলন)

কপারনিকস নিকোলাস (Copernicus Nicolas, 1473—1543) এবং গ্যালিলিও (Galileo, 1564—1642) প্রভৃতির অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন, পৃথিবীটাই সৃষ্টির জীবনকেন্দ্র আর উর্ধ ও নিম্নলোকের সব কিছুই ভূলোকের আর তার বাসিন্দাদের উপলক্ষেই বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু এ দৃষ্টিভংগীর বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন একথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ রূপেই মেনে নেওয়া হয়েছে যে, সূর্যের চতুর্দিকে যেসব অজস্র গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের পৃথিবীটা সেই সূর্যবংশের কোটি কোটি পরিবারের একটি ক্ষুদ্র সত্তা মাত্র। সুতরাং পৃথিবীটা যদি একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাতে এই বিরাট পরিবারের দৈনন্দিন ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটার কোন আশংকাই নেই আর পৃথিবীর জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলার ব্যাপারটাতো উল্লেখ যোগ্যই নয়। এরূপ দুর্ঘটনা বহুবার সৌরমণ্ডলে ঘটেছে আর নিত্যই নাকি ঘটে থাকে অথচ এর ফলে সৌরমণ্ডলের গতিবিধি ও দৈনন্দিন কার্যকলাপের কোন পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হয়না।

মানুষ সৃষ্টির মৌলিকশক্তির রহস্য ভেদ করে ফেলেছে, অণু পরমাণুর বুক চিরে তার ভেতর মানুষ অবতরণ করেছে আর এনার্জির মূল উৎস সে খুঁজে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। আণবিক শক্তির চাবিকাঠি হস্তগত করার পর মানুষ দ্রুতবেগে এমন দিকে ধাবিত হচ্ছে যে, চোখের নিমিষে সে স্বহস্তে এখন তার পূর্ণ বিধ্বস্তির ব্যবস্থা করতে সক্ষম। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিদ্যার দিক দিয়ে মহাপ্রলয়ের সম্ভাব্যতা আগের চাইতে অনেক বেশী বেড়ে গেছে, একে অস্বীকার করার এখন আর কোন বৈজ্ঞানিক-অবকাশই নেই। অবশ্য এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী অবস্থা কি হবে, ধ্বংসের পর পুনর্গঠনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে কিনা, জীবনের পুনর্বিকাশ ঘটবে কিনা, এসব বিষয়ে বিজ্ঞান নির্বাক রয়েছে আর সত্যিই তার পক্ষে নির্বাক থাকা ছাড়া গত্যন্তরই বা কি? কারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সহায়তায় এসব বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার উপায় নেই। অবশ্য একথা বলা বোধ হয় অসংগত হবেনা যে, ইলহামী-বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর দাবী শত সহস্র শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার কষ্টিপাথরে আজ গ্রহণযোগ্য বলে যখন স্বীকৃত হয়েছে, তখন পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে ইলহামী বিজ্ঞানের দাবীর বাকি অর্ধাংশ মান্য করা হবেনা কেন? বিশেষতঃ এর অবৈজ্ঞানিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হচ্ছে।

গণক ও দৈবজ্ঞদের কল্পনা বিলাস

জ্যোতির্বিদ ও দৈবকের দলকে প্রলয়ের সময় নির্ধারণ করতে সর্বদা উৎসুক দেখা যায়। এসম্পর্কে তারা প্রায় নানারূপ তুকতাক উড়িয়ে থাকে। পুরাতন পাদ্রী ও খৃস্টান সন্ন্যাসীরা প্রচার করতেন যে, দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রলয়ের সন্ধ্যা নেমে আসবেই। বার্নার্ড (Bernard) নামে জনৈক

(৩৬০ পৃষ্ঠার পর)

করার জন্য লালসার বশবর্তী হইয়া সংগীত শ্রবণ করা হারাম এবং বৈধ উপায়ে স্বীয় দাসী অথবা স্ত্রীর নিকট হইতে উত্তম সংগীত শ্রবণ করা সন্দেহমূলক, কারণ এরূপ সংগীত 'লহও' এর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে আর সংগীতের এরূপ তাৎপর্য যাহা সঠিক পথের দিশারী হয় এবং আল্লাহর পথে পরিচালিত করার জন্য ইংগিত দান করে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সংগীত শ্রবণ করা মুবাহ। * (ক্রমশঃ)

* আওয়ারিফুল মা'আরিফ (২) ২০৬ পৃঃ।

জার্মান সন্ন্যাসী বহু প্রাচীন এক পাদ্রীর বরাত দিয়ে ৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করতে আরম্ভ করেন যে, পৃথিবীর অবসান মুহূর্ত সমুপস্থিত হয়েছে। তিনি একথাও বলেন যে ৯৯২ খৃষ্টাব্দের 'গুড ফ্রাইডে'তে যীশুখৃস্টের আবির্ভাব বিঘোষিত হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে ৯৯২ সালে দলে দলে হাজারে হাজারে খৃস্টান নরনারী জেরুসালেমে উপস্থিত হন এবং পবিত্রভূমিতে প্রলয় দিবসের অপেক্ষা করতে থাকেন। এঁদের অধিকাংশই তাঁদের ভূসম্পত্তি বেচে ফেলেছিলেন, কেউ কেউ দান খয়রাতও করেছিলেন। শেষপর্যন্ত চরমভাবে বিঘোষিত হল যে, ১০০০ খৃস্টাব্দের ২৪শে মার্চে মহাপ্রলয় সংঘটিত হবেই। ড্রুথমার (Druthmar) নামে এক দরবেশের পবিত্র রসনা দিয়ে এই দিন তারীখের বিবরণ উচ্চারিত হয়েছিল। সেদিন জনগণ আতংকের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়ে পড়ে। গীর্জা আর ওলীদের কবরস্তানে তিলধারণের স্থান থাকেনা, দুপুর রাত্রি পর্যন্ত সকলেই ক্রুশের ছায়ার তলে প্রাণবিসর্জন করার পবিত্র আশায় অপেক্ষা করছিল। অসংখ্য ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা কড়ি লোকেরা গীর্জায়ও খানকায় দান করে ছিল।

দশম শতকের শেষার্ধে ও একাদশ শতকের প্রথমাংশে এক ভয়াবহ ব্যাপার ইউরোপে সংঘটিত হয়। সমস্ত ইউরোপে এমন এক মহামারী সংক্রামিত হয়ে পড়ে, যাতে করে রোগাক্রান্তদের দেহের মাংস পচে হাড় থেকে খসে পড়ত। তারপরেই এল মহা দুর্ভিক্ষ! এমন দুর্ভিক্ষ যে, মানুষ মানুষ ভক্ষণ করতে লেগে গেল। এক একটি ফল আর ডিমের বিনিময়ে সন্তান বিক্রিত হতে লাগল, জনক জননীরা শিশু সন্তানদের আর যুবকরা জনক জননীদের ভুনা কাবাব খেয়ে ক্ষুন্নবৃত্তি করতে সচেষ্ট হল। একবার এক ব্যক্তি বাযারে বিক্রয়ের জন্য মানুষের গোশ্‌ত নিয়ে এসেছিল!

এ দুর্যোগের অবসান হওয়ার সংগে সংগেই লোকেরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সমস্ত গীর্জা আর ধর্মীয় ইমারতগুলির সংস্কারের কাজ বিপুল উদ্যমে আরম্ভ হল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এই সুযোগে অপর্যাপ্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে পড়েছিল। কালো-যমের (*Black death*) হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে নিত্য নৈমিত্তিক পোষাকের নূতন নূতন ফ্যাশন আবিষ্কৃত হতে থাকল। বিবাহের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেল। পল্লী শহরগুলির জন সংখ্যাও বর্ধিত হল—যেন জীবন পুনরায় পৃথিবীর বুকে নেমে আসল আর মানুষ আবার তার দুনিয়ায় বিভোর হয়ে গেল।

১১৯৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় সতর্কবাণী বিঘোষিত হয় যে, বাবিলনিয়ার দজ্জাল (Antichrist) ভূমিষ্ট হয়েছে। সুতরাং অল্পদিনেই মানব গোষ্ঠির অবসান ঘটবে। কয়েকশ' বছর ধরে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

জার্মানীতে স্টফলার (Stoeffler) নামীয় জনৈক জ্যোতির্বিদ হযরত নূহের প্লাবনের মত এক বিশ্ব ধ্বংসকরী মহাপ্লাবনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে দিলেন। সংগে সংগে একথাও তিনি বলতে ভুললেন না যে, ১৫২৪ সালেই এই মহাপ্লাবন সংঘটিত হবে। ভয়ে উৎকণ্ঠায় শিল্প-বাণিজ্য সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল, কৃষকেরা চাষবাস ছেড়ে দিল; সমস্ত কাজ কর্ম থেমে গেল। ঋণপরিশোধের দায় থেকেও লোকেরা মুক্ত হল, প্রায় বিনামূল্যেই তারা জোতজমি বিতরণ করে ফেলল। কেউ কেউ পার্বত্য অঞ্চলে প্লাবনের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় নিল। অনেকেই নৌকা প্রস্তুত করতে লেগে গেল। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে, এই দুর্ঘটনা ফেব্রুয়ারী মাসে ঘটবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস নিরাপদে কেটে যাওয়ায় লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বিস্তু আর একজন রাজজ্যোতিষী শাসন কর্তাদের জানিয়ে দিলেন যে, স্টফ্‌লারের হিসেবে একটু ভুল ঘটে গিয়েছে। সঠিক তারীখ হচ্ছে ১৫২৫ সালের ১৫ই জুলাই, একথা আর প্রকাশ করা হলনা, কিন্তু ১৫ই জুলাই তারীখে যেমনি আকাশে মেঘের একটি সুদীর্ঘ রেখা প্রকট হয়ে উঠল, অমনি অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদ থেকে শকটের একটা দীর্ঘ মিছিল বেরিয়ে পড়ল। রাজবংশের সকলেই আর সরকারী কর্মচারীরা মায় সরকারী

কোষাগার এই মিছিলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদ্যুৎ-গতিতে মিছিলটি নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। জনসাধারণ-প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পেরে দিশাহারা হয়ে পড়ল। রাত্রিযোগে সামান্য রকম ঝড়তুফান উঠল বটে কিন্তু আসল ব্যাপারের কিছুই ঘটলনা। এই ধরণের চাঞ্চল্য আমেরিকায় সৃষ্টি করলেন উইলিয়ম মিলর (William Miller)। তিনি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন যে, ১৮৪৩ সালে পৃথিবীর শেষ পরিণতি ঘটবে। বাই-বেল অনুসারে অংক কষে তারীখ আর সময় নির্দেশ করতেও তিনি ত্রুটি করেননি। তিনি বললেন, ২১শে মার্চের মধ্যরাত্রে ধরিত্রীর মাটি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। ওঁর ভক্তরা পরমোৎসাহে প্রচার কার্যে মেতে গেলেন আর আসন্ন মুহূর্তের জন্য জনসাধা-রণকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন। প্রচার কার্য পরিচালিত করার জন্য অকুণ্ঠ অর্থ ব্যয় করা হল। এব্যাপারেও বহুলোকে গৃহের সরঞ্জামাদি দূরে নিক্ষেপ করল আর জোতজমি বেচে ফেলল। বাগানের ফলবন্ত গাছগুলো কেটে ফেলা হল, জমির প্রস্তুত-শস্যও তারা নষ্ট করে ফেলল। কিন্তু ঘটল এইযে, মহাপ্রলয়ের পরিবর্তে ফেব্রুয়ারীতে একটা ধুমকেতু পরিদৃষ্ট হল যা দ্রুতগতিতে সূর্যের দিকে এগিয়ে চলছিল। ওর পশ্চাদ্ভাগের পুচ্ছটির দৈর্ঘ ছিল বিশ কোটি মাইল, চারিদিকে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেল। যাঁরা প্রলয় কাণ্ডকে আগে অলীক ও অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদেরও বুক কেঁপে উঠল। ২১শে মার্চের সন্ধ্যায় বোস্টন শহর থেকে মানুষের বড় বড় কাফিলা গ্রামাঞ্চলের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে দিল আর সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু টিলার ওপর চড়ে সমবেত হল, যাতে করে উর্ধ জগতের দিকে যাত্রা সহজসাধ্য হতে পারে। ধুমকেতু দৃষ্টি-পথে পতিত হওয়া মাত্র প্রশস্তি ও ভজনের সুরে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এই ব্যাপার চলতে থাকার পর নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। সকলেই চুপচাপ অথবা ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘরে ফিরে এল।

ওয়েস্টফোর্ডে এক রসিক পুরুষ ছিলেন—ক্রজি এমস (Chroze Amos), তিনি এসব ভবিষ্য-দ্বাণীকে আমল দিতেননা। চুপি চুপি বেরিয়ে শস্যক্ষেত্রে লুকিয়ে পড়লেন। মিলারের ভক্তরা যখন তাঁদের ঘরে দুয়োর জানালা বন্ধ করে প্রলয়ের আগমন অপেক্ষায় আড়ষ্ট হয়ে সময় গুণছিলেন, ঠিক সেই সময় ক্রজি ঘোরে ঘোরে শিঙা ফুঁকতে আরম্ভ করলেন, ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভক্তের দল পলায়ন করতে শুরু করল। দ্বিতীয়বার ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে ভক্তের দল ভজন আরম্ভ করে দিল। অবশেষে ক্রজির দুষ্টামি ধরা পড়ায় সকলেই আশ্বস্ত হলেন। মিলারের অনেক ভক্ত এই ঘটনায় তাঁর দল পরিত্যাগ করে চলে গেল কিন্তু অনেকের ভক্তি এর-পরেও অটুট ছিল।

দৈবক ও জ্যোতির্বিদ ব্যতীত খগোল শাস্ত্র-বিশারদরাও প্রলয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে গবেষণার ত্রুটি করেননি। বিশেষ করে বর্ষাটে ধরণের ধুমকেতু গুলো সম্বন্ধে বারবার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ধরিত্রীর বুকের সাথে ওদের টক্কর লাগতে পারে। কুসংস্কার বাদীরা ধুমকেতুর আবির্ভাবকে কুলক্ষণ মনে করে থাকে আর খগোল বিশারদরা অংক কষে এই কুসংস্কারকে পরিপুষ্ট করে তোলেন।

১৭৭৩ সালে ল্যালেণ্ডির (Lalande) পক্ষ থেকে একাডেমি অব সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান পরিষদের সভাবৃন্দের সম্মুখে একটা প্রবন্ধ পাঠ করার কথা বিঘোষিত হয়। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "এরূপ ধুমকেতুর পর্যবেক্ষণ, যার পৃথিবীর বুক পর্যন্ত পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে"।

এই বিজ্ঞপ্তি পরিবেশিত হওয়ার সাথে সাথে একটা গুজবও প্যারিসে রটতে লাগল আর দেখতে দেখতে গোটা ফ্রান্সে আতংকের কৃষ্ণছায়া নেমে আসল। প্রচারিত হল যে, বিখ্যাত গণিত-শাস্ত্রবিদ ল্যালেণ্ডির হিসেব মত ১৭৭৩ সালের ২১শে মে তারীখে একটি ধুমকেতু পৃথিবীর গতিকক্ষ অতি-ক্রম করবে আর এই ধুমকেতুর টক্করে ধরিত্রী বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, প্রবন্ধে এরূপ ধরণের কোন কথারই উল্লেখ

ছিলনা কিন্তু প্রবন্ধের শিরোনাম আর সংবাদপত্র-স্তম্ভের অগ্রলেখের সংগে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত অনুমান ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তৃত বিবরণ তৈরী করে ফেল্লে। মানুষের আতংক এতদূর প্রচণ্ড হয়েছিল যে, ল্যালেণ্ডি স্বয়ং এক বিবৃতি দিতে বাধ্য হলেন আর প্রবন্ধ পাঠের সংকল্প পরিত্যাগ করলেন কিন্তু হিতে বিপরীত হল, লোকেরা বুঝে নিল যে, প্রবন্ধে যে ভয়াবহ আবিষ্কারের কথা উল্লিখিত আছে শুধু জনসাধারণের আতংক চাপা দেবার জন্যই সে প্রবন্ধ পাঠের কাজ মুলতবী হল। সংগে সংগে জনগণের চিত্তচাঞ্চল্যের সুযোগ গ্রহণ করে পাদ্রী সাহেবরা স্বর্গের টিকিট বিক্রি করতে লেগে গেলেন। নির্দিষ্ট দিন তারীখ কেটে গেল, কিন্তু খেলা হলনা।

১৮৩২ আর ১৮৫৮ সালেও এরূপ ধরণের দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আজ সে সব কথা বিদ্রূপ বলে মনে হয় কিন্তু প্রলয়ের সম্ভাব্যতা চিরাচরিত ভাবে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। ১৮৯৬ সালে হুইস্টন (Whiston) নামে একজন বৈজ্ঞানিক "পৃথিবী সম্পর্কে একটি নূতন পরিকল্পনা" A new theory of the Earth) শীর্ষক গ্রন্থে মহা প্রলয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পুনশ্চ ১৯৫০ সালে World of collision অর্থাৎ 'টক্করের দুনিয়া' নামে একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়ে আবার দুশ্চিন্তাকে জাগিয়ে তুলেছে।

যে সব সম্ভাবনার কথা বৈজ্ঞানিকরা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে ধুমকেতুর কথাটাই প্রণিধানযোগ্য। এই তারকাগুলো সূর্য বংশেরই বিশিষ্ট পরিবার, এগুলোর পৃষ্ঠদেশ একটু ভিন্ন ধরণের, সংখ্যাও বেশ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশকে এগুলো সমান্তরাল ভাবে অতিক্রম করে যায় বলে পৃথিবীর সাথে এদের টক্কর লাগার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশী। এই ধুমকেতুগুলো সূর্য ও পৃথিবীর অন্তর্বর্তী যে দূরত্ব রক্ষা করে চলে তাতে করে চল্লিশ কোটি বারের মধ্যে শুধু একবার মাত্র ওদের সাথে পৃথিবীর টক্কর লাগা সম্ভবপর। এ দুর্ঘটনার—সম্ভাব্যতা ঠিক এমনি, যেন কোন বালকের চোখে পটি বেঁধে তার সম্মুখে একটা ডিশ রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে চল্লিশ কোটি লজেন্স রয়েছে, এই চল্লিশ কোটির মধ্যে শুধু একটি লজেন্স বিষাক্ত। পটি বাঁধা ছেলেটির পক্ষে চল্লিশ কোটি লজেন্সের স্তূপে হাত দিয়ে শুধু ঐ বিষাক্ত লজেন্সটিকে বের করে নিয়ে যেমন মুখে পোরা সম্ভবপর, কোন ধুমকেতুর ধরিত্রীর পৃষ্ঠের সংগে টক্কর লাগাও তেমনি সম্ভবপর। প্রত্যেক বৎসরে ন্যূনাধিক পাঁচটি করে ধুমকেতু সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করে চলে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আট কোটি বছরে শুধু একবারই কোন ধুমকেতুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ সম্ভবপর। পৃথিবীর দুই অর্বুদ বছর বয়সের মধ্যে কমপক্ষে পঁচিশবার এরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া উচিৎ ছিল। ধুমকেতুর মাথার দিকে বাইরের বৃত্ত অথবা পুচ্ছের দিককার কোন অংশের সাথে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের টক্কর লাগা আরো অধিকবার সম্ভবপর। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, এ সব তারকার বস্তুতান্ত্রিক দৃঢ়তা এতই কম যে, ওগুলো পৃথিবী অথবা অন্য কোন গ্রহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অধীনে নিজেদের গতিকক্ষ চটকরে পরিবর্তন করে ফেলে। অনুমান করা হয়েছে ধুমকেতুর বস্তুতান্ত্রিক দৃঢ়তা পৃথিবীর দৃঢ়তার দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ, কিন্তু এ ধরণের একটি ধুমকেতুর ওজন হয়ে থাকে ৬০ লক্ষ কোটি টন। এত ওজনের টক্কর যে কেমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য ধুমকেতু গুলোর ফাঁপা বা নিরেট হওয়ার ওপরেই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা নির্ভর করে বেশী।

একটি ক্ষুদ্র ধুমকেতুর পৃথিবীর বুকে পতন ঘটেছিল কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে। মধ্য-উত্তর এরিজোনায় (Arizona) এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এমন একটা আগ্নেয়গিরি আজো বর্তমান রয়েছে যার ঘের হচ্ছে চল্লিশ হাজার ফুট।

সাইবেরিয়ায় একটি তারকা পাতের ব্যাপার ১৯০৮ সালের ৩০শে জুনে সংঘটিত হয়েছিল। বজ্রপাতের চাইতেও গর্জনের শব্দ ভীষণতর শুনা গিয়েছিল। আগুন

(৩৬৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

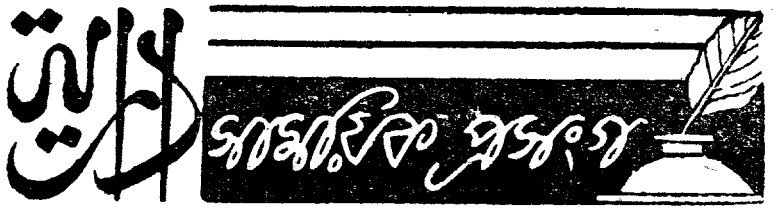

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

চিরঞ্জীব আব্বাদ পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্র!!

দীর্ঘ আট বৎসরকাল পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বিরচিত, গণপরিষদ কর্তৃক বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত এবং গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক বিগত ২রা মার্চ তারীখের দ্বিপ্রহরে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হইতে আল্লাহর শোক্‌র আদা' করিতেছি এবং পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দকে আমাদের অকপট মুবারকবাদ জানাইতেছি। বিগত ৫ই মার্চ তারীখে মেজর জেনারেল ইস্কেন্দার মির্জা পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতির আসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন! আগামী ২৩শে মার্চে পাকিস্তান ইনশাআল্লাহ 'ইছলামী গণতন্ত্র' রূপে বিঘোষিত হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান কায়েম হয় নাই বরং উহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ২৩শে মার্চ ১৯৫৬ হইতেই সূচিত হইবে। কারণ রাষ্ট্র গঠন করাই বড় কথা নয়, রাষ্ট্রকে স্বাধীন সাম্রাজ্যের আসনে দাসত্বের সমুদয় শৃংখল হইতে মুক্ত করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠা দান করাই আসল কথা। আট বৎসর হইল পাকিস্তান কায়েম হইয়াছিল কিন্তু তাহার নিজস্ব শাসনতন্ত্র না থাকায় এতদিন পর্যন্ত লক্ষহারা তরণীর মত সে অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিল। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সম্বন্ধে শাসক গোষ্ঠির ও নাগরিকবৃন্দের কোনই সম্বিৎ ছিলনা। ফলে দিন দিন শাসন সৌকর্যে দায়িত্বহীনতার প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া চলিয়াছিল। শাসনকর্তাগণ নিজেদের খোশ খেয়াল মত যদৃচ্ছভাবে তাঁহাদের স্বপ্নবিলাস চরিতার্থ করিতেছিলেন, রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না থাকায় রাষ্ট্র বিরোধী নীতি নৈতিকতা ও কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা সম্ভবপর ছিলনা। ফলে পাকিস্তান এরূপ সংকটজনক পরিবেশে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহের রেখাপাত হইয়াছিল।

পাকিস্তান শাসনতন্ত্র অনুসারে এই রাষ্ট্রের অধিনায়ক একমাত্র মুছলমান হইবেন এবং রাষ্ট্রের নামও 'ইছলামী গণতন্ত্র' হইয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তানের অনুরূপ রাষ্ট্রের পূর্বাংশও পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত হইয়াছে। ইছলামী শাসনতন্ত্র এই রাষ্ট্রে প্রবর্তিত হইবে এবং কোরআন ও ছুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হইবেনা এরূপ আশ্বাস শাসনতন্ত্রে বিদ্যমান থাকিলেও ইছলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের এবং ইছলামপন্থী দল সমূহের দাবী দাওয়ার বৃহত্তম অংশই পূরণ করা হয় নাই। পাকিস্তানের সর্বদলীয় উলামা কনভেনশনের সংশোধনীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ইছলামী শাসন প্রবর্তন করার জন্য এই সংবিধানে যে পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে পর্বত পরিমাণ বাধা বিঘ্নেরও অভাব নাই। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়াও এই শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত বলা চলেনা কিন্তু এসব সত্বেও আমরা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য আমাদের অন্তরে অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি।

আমরা ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে সমর্থ যে, কিরূপ পরস্পর বিরোধী পরিবেশে শত সহস্র বাধাবিঘ্নকে

উল্লংঘন করিয়া প্রধান মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ছাহেবের ঐকান্তিকতা ও দূরদর্শিতার ফলে শাসনতন্ত্রের তরণী ঘাটে পৌছিয়াছে। আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি যে, একদল লোক যাঁহারা ইছলাম ও পাকিস্তানের আদর্শের সহিত আগাগোড়া বিরোধ করিয়া আসিতেছেন, এমনকি পাকিস্তানের সংগ্রামেও যাঁহারা বিরুদ্ধ বাহিনীর সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইছলাম ও ইছলামী আদর্শকে উপহাস করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের দলভুক্ত অনেক সুযোগসন্ধানী পাকিস্তানের শাসকবর্গের অযোগ্যতা, নীতিহীনতা এবং জনগণের মূর্খতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা সাজিয়া বসিয়াছেন!

আমরা আরো অবগত আছি যে, একদল ইছলামের শত্রু কম্যুনিজমের পতাকাবাহী গণতন্ত্রের শ্লোগান তুলিয়া পাকিস্তানের পূর্বার্ধকে পশ্চিমার্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া ইছলাম বিরোধীগণের সমবায়ে সর্ববিধ আইন কানুন এবং শান্তি ও শৃংখলার অবসান ঘটাইয়া পাকিস্তানে অরাজকতার পথ সুগম করার অভিসন্ধিতে শাসনতন্ত্র মাত্রেরই সকল সময় বিরোধ করিয়া আসিতেছে। সর্বোপরি দলীয় ভেদবুদ্ধি, স্বার্থপরতা ও অতিলোভ শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করার পথে এই রাষ্ট্রে গোড়াগুড়ি হইতেই অন্তরায় হইয়া আছে। এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভিপ্রেত ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন ও প্রবর্তনের আশা আমরা কোন সময়েই দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে পারি নাই আর সত্যই আমাদের সে আশা পূর্ণও হয় নাই। ফলে বর্তমান শাসনতন্ত্রটি যেমন যথার্থ ইছলামী শাসনতন্ত্র নয় সেইরূপ উহাকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পর্যায়েও পুরাপুরি ভাবে ফেলিতে পারাযায়না।

কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ইছলাম ও গণতন্ত্রের যে সকল নীতি এই শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, পাকিস্তানের অধিনায়ক ও শাসকবর্গ যদি বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার সহিত সেগুলির মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, তাহাহইলে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যথার্থ আকারে ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিবেই। শাসক ও নেতৃবৃন্দকে এই পথে অগ্রণী করিতে হইলে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর ইছলামপন্থীদিগকে অধিকতর উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা সহকারে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

(৩৬৪ পৃষ্ঠার পর)

ও ধোঁয়ার এক বিরাট বল আকাশে উত্থিত হয়ে কৃষ্ণ নিবিড় মেঘের আকারে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে তার পনর মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্তের সমস্ত গাছপালা ভেংগে চুরমার হ'য়ে যায়। পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী স্থানে একজন কৃষক এরূপ গরম হাওয়ার পরশ অনুভব করে যে, তার কাপড়ে আগুন লেগে যাবে বলে সে ধারণা করেছিল। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দের আঘাতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, জ্ঞান ফিরে আসার পর সে দেখতে পায়, তার বাড়ীখানা বিধ্বস্ত হয়েছে। আর একটি এলাকায় প্রায় দেড় হাজার মানুষ নিহত হয়, একখানা ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে থেমে যায়। এক মাইলের ভিতরেই প্রায় দুশো' অগ্নেয়গিরি পরিদৃষ্ট হয়। প্রফেসর কুলিক (Kulik) অনুমান করেছেন যে, পতিত তারকা পিণ্ডের ওজন ৪০ হাজার টন ছিল।

এখন কল্পনা করা যেতে পারে যে, সব চাইতে কম ওজনের এই ধুমকেতু যদি কখনো পৃথিবীর সংগে হাত মিলিয়ে বসে, তাহলে তার পরিণাম কি হতে পারে?

আরো একটা আশংকার কারণ দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ পুচ্ছধারী কোন ধুমকেতুর লেজ যদি পৃথিবীর বুকে পরশ দিয়ে যায় তাহলে এত বিষাক্ত গ্যাসের আমদানী হবে যে, গোটা মানব গোষ্ঠিই তাতে করে স্বচ্ছন্দে ধ্বংস হতে পারে। কার্বন মন অক্সাইড (Carbon mon oxide) যা—নরহত্যা আর আত্ম হত্যার ব্যাপারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর কিয়ানোজেনের—(Ceanogen) মত বিষাক্ত গ্যাসের অস্তিত্ব ধুমকেতুর ভিতর বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া হাইড্রোজেন ও ম্যাথেলিন প্রভৃতি অগ্নিগ্রাসী গ্যাসও ধুমকেতুতে আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর গতিবক্ষে ধুমকেতুর পুচ্ছ হ'তে একটি স্ফুলিংগ পতিত হওয়াই এই মৃন্ময় গোলককে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট!

ইছলামী শাসনতন্ত্রের আদর্শ, নীতি ও কার্যক্রমকে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ব্যাপকভাবে দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে হইবে, যাহার ফলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনগণ ইছলামী শাসনতন্ত্রের সাফল্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়া উহার প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল শক্তি সহকারে আগাইয়া আসিতে পারে।

পথের বৃহত্তম বাধা

পাকিস্তানের দুশমন ও ইছলাম বিরোধীগণ যত দলে এবং যত মতেই বিভক্ত থাকুননা কেন, ইছলামের বিরুদ্ধে, মুছলিম সমাজের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা কল্পে পাকিস্তানের সংগ্রাম আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সকলেই জোট পাকাইয়া সংঘবদ্ধ ভাবে তাহাদের কার্য চালাইয়া যাইতেছেন অথচ ইছলামপন্থী দলগুলি কোনক্রমেই এক কেন্দ্রিগ হইতে পারিতেছেনা। ইছলামী আদর্শের যতগুলি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে যথা, মুছলিম-লীগ, নিযামে ইছলাম, ইছলামপার্টি, রব্বানীপার্টি, আওয়ামী মুছলিমলীগ, ইছলামী জামাআত এবং হিযবুল্লাহপার্টি প্রভৃতি সকলেই পাকিস্তানে ইছলামের প্রতিষ্ঠা ও ইছলামী আদর্শবাদের উন্নয়নকল্পে আগ্রহান্বিত বলিয়া দাবী করিতেছেন কিন্তু ইঁহারা ইছলাম বিরোধী দল সমূহের মত একটি সর্বদলীয় কর্মসূচীর অনুসরণ করিতে পারিতেছেননা কেন, আমাদের পক্ষে তাহা হৃদয়ংগম করা সহজসাধ্য নয়। আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, নিযামে ইছলাম পার্টি ইছলামী-জামাআতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় সত্তাকে বিলীন করিতে রাযী হইবেনা আর ইছলামী জামাআতও কোনক্রমেই মুছলিম লীগের সহিত আপোষ করিতে সম্মত হইবেনা। আওয়ামী মুছলিম লীগের সদস্য-বর্গের অথবা রব্বানীপার্টির কর্মীদের পক্ষে মুছলিম-লীগে ফিরিয়া যাওয়ার আশা সুদূর পরাহত। এমতাবস্থায় ভোটের লড়াই জিতিবার পক্ষে এই সকল পার্টির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব জিয়াইয়া রাখা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইলেও ইছলামী স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পে এই দলীয় ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত অশুভ ও সর্বনাশকর।

আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের হিফাযতে এবং ইছলামের ভবিষ্যতকে ইছলাম বিরোধী-দলের শত্রুতার কবল হইতে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে একটি এক-কেন্দ্রিগ 'সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট' গঠন করার কার্যকে বিবেচনা করিয়া দেখার পুনরাহ্বান জানাইতেছি।

মীনা বাযার

'পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্র' দিবস প্রতিপালন করার জন্য যে সকল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সরকারী ভাবে করা হইয়াছে বলিয়া আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখিতে পাইতেছি, তন্মধ্যে নাচ, গান ও মীনাবাযারের ব্যবস্থা সমধিক উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বভার যে সকল ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন, গোড়াগুড়ি হইতেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে অ্যাংলো-মুছলিম অথবা অ্যাণ্টি-ইছলাম মুছলিমদের সংখ্যাই অধিক। যে সকল বিলাসিতা ও পাপাচরণের জন্য বাগ্দাদ, স্পেন ও দিল্লীর ইছলামী রাজ্যসমূহের পতন ঘটিয়াছিল এই তথাকথিত মুছলিম নেতা ও শাসকদল তাঁহাদের কুরুচির বশবর্তী হইয়া সেই সকল বিলাসিতা ও পাপাচরণকে পাকিস্তানের তমদ্দুন ও কৃষ্টিরূপে গ্রহণ ও প্রবর্তন করিতে উৎসাহ বোধ করিয়া থাকেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, নীতি নৈতিকতার শিথিলতা ও আমোদ প্রমোদের একান্ত আগ্রহ জাতীয় জীবনের পক্ষে শুধু নিগ্রহই নয় মৃত্যুবাণও বটে। আজ যখন পাকিস্তানকে ইছলামী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হইতেছে তখন জাতীয় জীবনের এই পবিত্র প্রথম জাগরণ মুহূর্তে ইছলামী জীবন-ব্যবস্থাকে গৌরবমণ্ডিত করার চেষ্টার পরিবর্তে অনৈছলামিক দৃষ্টিভংগীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কল্পে নাচ, গান ও মীনা বাযারের সরকারী তৎপরতা বাস্তবিকই অতিশয় লজ্জাকর। অন্ততঃ সরকারী আয়োজনগুলি যাহাতে ইছলাম বিরোধী কার্যকলাপ হইতে মুক্ত থাকে, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষগণের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

ইছলামী রাষ্ট্রের কথা বাদ দিয়া শুধু গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী লইয়া বিচার করিলেও একথা সহজেই বুঝা উচিত যে, এই অ্যাংলো-মুছলিম এবং অনৈছলামিক আদর্শের ভক্তবৃন্দই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সব কিছু নন। সরকারী কর্মচারীদের খোশ-খেয়ালমত মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে জনগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ার কাহারো কোন অধিকার নাই আর কিছুক্ষণের জন্য দিল্লীর মোহাম্মদ শাহ রঙ্গীলার মুরীদগণের প্রতিপক্ষ দলকে যদি সংখ্যালঘু বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি অমুছলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত সংস্কারকে পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীরা যেরূপ সমীহ করিয়া চলেন, মুছলিম সংখ্যালঘুদের মতবাদ ও সংস্কারকে ততটুকু সমীহ করাও কি তাঁহাদের কর্তব্য নয়? ফলকথা, ইছলামী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইছলামী রুচি ও নির্দেশের গৌরব যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে আমরা আমাদের শাসক-সমাজের নিকট তাহারই প্রত্যাশা করি।

শিক্ষার নীতিগত সংস্কার

কতকগুলি শাস্ত্রের পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করার নাম শিক্ষা নয়। তরবীয়ৎ বা চরিত্র গঠন শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক নীতিকে উপেক্ষা করিয়া চলার দরুণ আমাদের শিক্ষাগারগুলি ইছলাম-বিরোধী দলের ক্যাম্পে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যে সকল দেশের অনুকরণ করিয়া চলাকে আমাদের শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ গৌরবের কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সে সকল দেশে রূহানী তরবীয়তের দিকে মনোযোগ দেওয়া না হইলেও তাঁহাদের শিক্ষাগারগুলি রাষ্ট্র বিরোধী দলের ক্যাম্পে পর্যবসিত হয় না। আমাদের ছাত্র সমাজ যদি পাকিস্তানের আদর্শ, ধর্মীয় দৃষ্টি ভংগী এবং সামাজিক নীতি নৈতিকতার ধার ধারার সুযোগলাভ না করেন, তাহাহইলে অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া বা ভারতের পক্ষে পাকিস্তান অধিকার করার জন্য অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না।

সুখের বিষয় আমাদের শিক্ষা বিভাগ এ সম্পর্কে নাকি সম্প্রতি কতকটা সচেতন হইয়াছেন। খোশ-খবরের ঝুটও ভাল! তাঁহারা নাকি বিভিন্ন শিক্ষাগারের শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের জন্য নমাযের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ সম্পর্কে পূর্বপাক সরকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদিগকে নির্দেশও নাকি প্রদান করিয়াছেন। নমায আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠতম উপায়রূপে ইছলামী জীবনের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে যদি সত্য সত্যই সরকারের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহাহইলে 'পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্রে'র পক্ষে ইহা যে শুভলক্ষণ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

খাদ্য সংকট

দেশব্যাপী খাদ্য সমস্যা যেরূপ সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তাহা লক্ষ করিয়া শাসন কর্তৃপক্ষ পুনঃপুনঃ আশ্বাস প্রদান করা সত্ত্বেও আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। মফঃস্বলের অনেক স্থান হইতে আমরা অনাহার, অর্ধাহার এবং অখাদ্য আহারের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। গতবারের বন্যার প্রকোপে যে খাদ্য সংকট পরিলক্ষিত হইয়াছিল, জনগণ তাহাদের অস্থাবর বিক্রয় করিয়া তাহার মুকাবিলা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবারকার দুরবস্থার— বৈশিষ্ট এই যে, কৃষকের গৃহে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা বিক্রয় করিয়া তাহারা দৈনন্দিন আহার্যের সংস্থান করিতে পারে। পরিশ্রম করিয়া তাহারা যে তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিবে তাহারো কোন উপায় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট সরকার যে দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া মওজুদ খাদ্য শস্য নাম মাত্র মূল্যে গুদাম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমুদয় লভ্যাংশ পুঁজিপতি, ধনিক ব্যবসায়ীও তাহাদের দালালদেরই পকেটস্থ হইয়াছে। দুর্বুদ্ধির সংগে অব্যবস্থাও যে ইহার জন্য দায়ী তাহা পূর্বেই আমরা প্রমাণিত করিয়াছি। দেশের ভিতর খাদ্য শস্যের মূল্য এক দিকে যেরূপ জনগণের ক্রয় শক্তির উর্ধে উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত হইতে দৈনিক হাজার হাজার মণ খাদ্য শস্য ভারত সীমান্তে অবৈধভাবে

রফতানী হইতেছে। যাহারা পাকিস্তানকে খামারে পরিণত করিয়া অবিরত উহার শোষণে মশ্‌গুল রহিয়াছে তাহাদের গুদামের বস্তাবন্দী খাদ্য শস্যের পরিমাণ আমাদের জানা নাই এবং এই সকল—মুনাফাখোর দেশদ্রোহীদের আচরণের কোন্ সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহাও আমরা—অবগত নই।

মফঃস্বল শহরের সর্বত্র রেশনিংয়ের ব্যবস্থা অবিলম্বিত হয় নাই। আর রেশনে খাদ্য শস্যের যে মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহাও জনগণের ক্রয় শক্তির আয়ত্তের বাহিরে। সুদূর পল্লী অঞ্চলের তো কথাই নাই। জনগণের পেটের আগুনে ইন্ধন যোগাইয়া একশ্রেণীর লোক দেশে বিদ্রোহ ও 'ট্যাক্স বন্ধ' আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইতেছি। দেশকে এই আসন্ন সংকট হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্বপ্রথম খাদ্য সমস্যার সমাধান সরকারকে যে উপায়েই হউক করিতে হইবে।

কাশ্মীরের নূতন পরিস্থিতি

দীর্ঘ অবসাদ ও অচলাবস্থার পর কাশ্মীর সমস্যা নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে আটটি দেশের পররাষ্ট্র-সচিবগণ পাকিস্তানের দাবী সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দীর্ঘ আট বৎসরের পুরাতন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের জাতিসংঘ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন উহাকে সমর্থন দান করার জন্য পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, পরিষদের সদস্যগণ জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুসারে গণভোটের সাহায্যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত পাকিস্তানের দাবীর প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। মন্ত্রী পরিষদ এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ডুরাণ্ড লাইনই আন্তর্জাতিক সীমারেখা। জাতিসংঘের প্রস্তাব বানচাল করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিগণ কাশ্মীর সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও পরিষদ পাকিস্তানের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কাশ্মীর সম্পর্কে বৃটিশনীতি পাকিস্তানের দাবীর অনুকূল হইবেনা বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীও পরিষদের অভিমত মানিয়া লইয়াছেন।—কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের দাবী এতই সুস্পষ্ট ও ন্যায় সংগত যে, সালিস ও ন্যায় বিচারের সাহায্যে উহাকে উড়াইয়া দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পক্ষে ভারতের একগুয়েমী, স্বার্থপরতা ও অহংকার যে পরিমাণে দায়ী, তাহার তুলনায় পাক সরকারের দুর্বল ও গড়িমসি নীতি অধিকতর দায়ী। জাতিসংঘের মত প্রধানমন্ত্রী সংঘও যদি শুধু নীতিগতভাবে গণভোটের ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া ক্ষান্ত হন, তাহাতে কাশ্মীর সমস্যার যথার্থ কোন মীমাংসা হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস—করিনা। অবশ্য প্রধান মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ছাহেবের কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতের এই অনভিপ্রেত সিদ্ধান্তটি 'সিয়াটো'র বৈঠক গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ফলে পাকিস্তানের দাবী নীতিগতভাবে যে অধিকতর—বলিষ্ঠ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার জন্য আমরা সত্যই আনন্দিত, কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত সমাধান যে একমাত্র পাকিস্তানের বজ্রমুষ্টির উপরেই নির্ভর করে, মরহুম লিয়াকত আলী শহীদের এই উক্তির প্রতি আজও আমাদের দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে।

খুলনা-যশোহর জিলা আহ্‌লে হাদীছ কনফারেন্স

বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারীখে খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমা টাউনে খুলনা-যশোহর জিলা আহ্‌লে হাদীছ কনফারেন্সের অধিবেশন বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব আবদুল বারী খান এবং সেক্রেটারী মওলবী আবদুল গফুরের সাদর আহ্বানে এবং জিলা জমঈয়তের নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের নগণ্য খাদিম ও তর্জুমানের

দীন সম্পাদক জমঈয়তের প্রচারকগণ সমভিব্যাহারে উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় আহ্‌লে হাদীছ আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ ও দাবী এবং দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব, ইছলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ, কার্যসূচী এবং জাতীয় সংহতির প্রয়োজন সম্পর্কে সমাগত আলিমগণ বিস্তৃত আলোচনা করেন। সভায় অন্যূন ২০ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। কর্মীগণ যেরূপ পরিশ্রমের সহিত কনফারেন্সের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং মেহমানদিগকে আদর আপ্যায়নে যেভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারী ছাহেবান তাঁহাদের মূল্যবান সময়ের কতকাংশ জাতীয় সংগঠন ও ইছলামী আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে জমঈয়তের কর্মীগণের সমবায়ে যদি ব্যয় করিতে পারেন, তাহা হইলে বাস্তবিক অত্যন্ত সুখের কারণ হইবে এবং ইহার ফলে আন্দোলনের কার্য ইনশাআল্লাহ অধিকতর সাফল্য লাভ করিবে।

শোক প্রকাশ

আমরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, পাবনা সদর মহকুমার সুযোগ্য এস, ডি, ও, জনাব রজব আলী মজুমদার বিগত ১২ই মার্চের দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তিনি কর্তব্যপরায়ণ এবং কঠোর পরিশ্রমী সরকারী কর্মচারী ছিলেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতেননা। ইহার ফলে কিছু দিন হইতে তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র দুই দিন পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় মফঃস্বল হইতে [redacted] হন। আমরা সরকারী কর্মচারীদের স্তুতিবাদক নই, শুধু সত্যের অনুরোধে একথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছিনা যে, পাকিস্তানের এই দুঃসময়ে তাঁহার মত নির্লোভ কর্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা রাজ পুরুষের তিরোধানে আমরা সত্যই অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেছি। তাঁহার দৃঢ় চিত্ততা ও কর্তব্য নিষ্ঠা এবং পাকিস্তান প্রীতির জন্য ইছলাম বিরোধী দল সামান্য কিছু দিন পূর্বেও তাঁহার বরখাস্তের দাবী উপস্থিত করিয়াছিল এবং তিনি সুবিধাবাদীদের—বিষ নজরে পতিত হইয়াছিলেন। আমরা প্রার্থনা করি, আল্লাহ মরহুমকে তাঁহার কর্তব্য নিষ্ঠার অফুরন্ত পুরস্কার দ্বারা বিভূষিত করুন! আমরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পুত্রকন্যা এবং আত্মীয় স্বজনদিগকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদকের আবেদন

বিভিন্ন স্থান হইতে বন্ধুবর্গ সম্পাদকের নিকট নানারূপ পত্র লিখিয়া থাকেন। অনেকেই বিভিন্ন মছ্‌আলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদও করেন। কিন্তু এই সকল পত্র ও জিজ্ঞাসার জওয়াব সব সময় প্রদান করা সম্ভবপর হয়না। ইহার কারণ এইযে, তর্জুমানের দীন সম্পাদক বিগত কয়েক বৎসর যাবত অন্যান্য ব্যাধির সহিত চক্ষুরোগেও কষ্ট পাইতেছে। চোখের এই ছানী বর্তমানে এরূপ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে যে, লেখাপড়ার কাজ একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহার সমস্ত সময় তর্জুমানুল হাদীছের পিছনেই ব্যয় হইয়া থাকে, পত্র ও জিজ্ঞাসাবাদের জওয়াব লেখাইবার অবসর করা সম্ভবপর হয়না। আশা করি বন্ধুবর্গ সম্পাদকের এই দুরবস্থাকে স্মরণ রাখিবেন এবং পত্রাদি লেখার ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আরো অনুরোধ এইযে, দীন সম্পাদকের পক্ষে পর্যটনের শ্রম স্বীকার করা ও সভাসমিতিতে যোগ দেওয়াও আর সম্ভবপর হইতেছেনা। একস্থানে বসিয়া যেটুকু খিদমত আনজাম দেওয়া হইতেছে তাহাকেই আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করা উচিত। এই দীন সম্পাদক বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে সকল সময় তাঁহাদের দোআ প্রত্যাশা করিতেছে।